রোকেয়া স্মারকগ্রন্থ

অর্হা নন্দিনী

রোকেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
টেলিফোন: (০৭২১) ৭১১২০২
ওয়েবসাইট: http://www.ru.ac.bd/rokeyahall/
ই-মেইল: provost.rokeyahall@ru.ac.bd

রোকেয়া স্মারকগ্রন্থ

অর্হা নন্দিনী

সম্পাদক
মোবার্‌রা সিদ্দিকা

সম্পাদক : মোবার্‌রা সিদ্দিকা

সম্পাদনা সহযোগী : হোসনে আরা খানম
তানিয়া তহমিনা সরকার
গোলাম রাশেদ
মনি কৃষ্ণ মহন্ত

প্রকাশক : রোকেয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রচ্ছদ : বনি আদম

আলোকচিত্র : গোলাম রাশেদ

মুদ্রণ : উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

শুভেচ্ছা মূল্য : ২৭০ টাকা

ORHA NANDINI commemorative volume of Rokeya Edited by Mobarra Siddiqua, Published by Rokeya Hall, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Price: 270/-

উৎসর্গ

রোকেয়া হলের সাবেক ও বর্তমান সকল ছাত্রীকে

মাননীয় উপাচার্যের শুভেচ্ছা বক্তব্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রীহল রোকেয়া হল প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর প্রথমবারের মতো *অর্হা নন্দিনী* নামক একটি রোকেয়া স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি ও হল প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এ জাতীয় শিক্ষাসম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবে সেটাই কামনা করি। এ ধরনের শিক্ষা সহায়ক প্রকাশনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানচর্চার উন্নতধারাকে অনুভব করা যায়। গবেষণায়, সৃজনশীলতায়, নতুন নতুন উদ্ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আমাদের জ্ঞান সৃষ্টির আধার পরিপূর্ণ হবে, দেশের উন্নয়নে ও সফলতায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান যুক্ত হবে।

রোকেয়া স্মারকগ্রন্থ *অর্হা নন্দিনী* প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি রোকেয়া হল প্রশাসনকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। তাদের এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক।

আমি রোকেয়া হলের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার
উপাচার্য
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের কথা

রোকেয়া হল উত্তরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রীহল। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এ হলে কোন প্রকাশনা বাস্তবতা পায়নি। অথচ যার নামে এ হল প্রতিষ্ঠা তিনি সমাজ-সংস্কারে, নারীজাগরণে, মননের উৎকর্ষতায় লেখালেখিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে রোকেয়ার অভিজ্ঞান অনেকটাই নামকরণে সীমাবদ্ধ। মননের চর্চায় ও প্রকাশে রোকেয়া বাংলার জনজীবনে এমন এক অভিঘাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার প্রভাবে আজকের বাঙালি সমাজে সকল কর্মে নর-নারীর যৌথতার স্বীকৃতি মিলে। তাই রোকেয়ার পরিচিতিকরণে কোন বিশেষণ এখন আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার অভাবে রোকেয়া এখন আদর্শের জায়গা থেকে দূরে সরে গিয়ে অনেকটাই নামসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তাই এমনও ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে, রোকেয়া দিবসের ব্যানারে রোকেয়ার ছবি হিসেবে স্থান পেয়েছে অন্য কোন মহীয়সী নারীর ছবি। এ অজ্ঞানতার লজ্জা সকলের। কুণ্ঠার সাথে বলতে হচ্ছে, এমনকি রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরাও অজ্ঞাত রয়েছে রোকেয়ার আমৃত্যু কর্মসাধনা বিষয়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে গত ২০১৮ সাল থেকে প্রথমবারের মতো রোকেয়া হল প্রশাসন রোকেয়া দিবসকে আবাসিক শিক্ষার্থীদের নিকট গুরুত্ববহ করে তুলতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানগর্ভ কথামালা শোনানোর আয়োজন করে। সেবছর রোকেয়াকে জানতে একেবারেই ভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার আলোর দিশারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে সারাদিন কাটিয়েও রোকেয়ার ভাবনা একজন বিজ্ঞানীকে কীরূপ আলোড়িত করে তা জানতে পারা যায় বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও প্রফেসর ইমেরিটাস অরুণ কুমার বসাকের বক্তব্যে। পরবর্তীবছর অর্থাৎ ২০১৯ সালের রোকেয়া দিবসেও একইভাবে আমরা ঋদ্ধ হয়েছি আরেকজন আলোকিত মানুষের অভিভাষণে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রফেসর সনৎকুমার সাহা মুখ্যবক্তা হিসেবে তাঁর রোকেয়া-দর্শন তুলে ধরেন। কিন্তু পরের বছর রোকেয়া দিবসকে এভাবে আর উদ্‌যাপন করা যায়নি। ২০২০ সালের বৈশ্বিক অতিমারি করোনার বিষে আমরা জর্জরিত হয়েছি প্রচণ্ডভাবে। কোভিড-১৯ এর ছোবল থেকে রক্ষা পেতে অনিবার্য কারণে ছাত্রীদের বিদ্যায়তনিক আবাসস্থলের দরজা যেমন বন্ধ করতে হয়েছে, তেমনি রোকেয়া স্মরণে জ্ঞানপ্রদীপসম বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুদের বক্তব্য, কথামালা ও সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হতে হয়েছে। ভার্চুয়াল সংযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততায় করোনাকালীন এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হলেও শূন্যতাটা রয়েই যায়। এরই প্রেক্ষাপটে রোকেয়া দিবসে পেশকৃত সম্মানীয়জনের অভিভাষণসমূহকে পরবর্তী সময়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করার মানসে *অর্হা নন্দিনী*র প্রকাশ। এর কলেবরকে বৃদ্ধি করে গ্রন্থরূপ দিতে রোকেয়া হল প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকগণ স্বীয় পর্যবেক্ষণে রোকেয়াকে মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন; তা বিশিষ্টজনের রচনার পাশে স্থান দিয়ে গুরুর দেখানো পথে শিষ্যের চলার একান্ত অভিপ্রায় হিসেবে দেখা হয়েছে। এতদসঙ্গে দু'জন আবাসিক শিক্ষার্থীর লেখাও যুক্ততা পেয়েছে। লেখাগুলোর মানবিচার ব্যতিরেকে পক্ক-অপক্কের একত্র সন্নিবেশে আনন্দময় পথচলা নির্মাণই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। তাই প্রাচীন-অর্বাচীন, গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সহাবস্থান আমাদের সম্মুখে আলোর হাতছানিকেই নির্দেশ করে, যা বিশ্বলোকের শিক্ষাগৃহে সর্বজনের প্রবেশ-দ্বার উন্মোচন প্রয়াসী। করোনায় আকস্মিক ও দীর্ঘ হল বন্ধের কারণে অন্য শিক্ষার্থীবৃন্দের রচনা পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখা নিয়ে পৃথক সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা রয়েছে।

হলের সম্মুখ দেয়ালস্থ রোকেয়ার প্রতিকৃতি স্থাপন ও এর উদ্বোধনকে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করার মানসে রোকেয়া স্মারক গ্রন্থ *অর্হা নন্দিনী*র প্রকাশকে সংযোজিত করা হয়েছে। রোকেয়ার নামে হল প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৪০ বছরেও তাঁর কোনো ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি এখানে স্থাপিত হয়নি। এবছর রোকেয়ার প্রতিকৃতি স্থাপন ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর নানা আয়োজনের মধ্যে *অর্হা নন্দিনী*র প্রকাশ ও রোকেয়ার প্রতিকৃতি স্থাপন একইসূত্রে গ্রথিত। বাঙালি জাতির

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষিত ও মুক্তমনা মানুষ তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সোনার বাংলা গঠনে উচ্চশিক্ষা স্তরের কারিগরদের তাই নিয়মনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ করেননি। বঙ্গবন্ধু শিক্ষিত ও স্বনির্ভর নর-নারীর স্বাধীন ও যৌথ-পথচলায় বিশ্বাসী ছিলেন, যা ছিল ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি নারী রোকেয়ারও একান্ত স্বপ্ন-কামনা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে নর-নারীর সমান অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, নাগরিক হিসেবে একজন নারীও পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্নে'র বাস্তব নারীমূর্তি। বলা যায়, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে রোকেয়ার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি মিলত না। স্বাধীন বাংলাদেশেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোকেয়ার নামে আবাসিক হল গড়ে উঠে। রোকেয়ার ম্যুরাল উদ্বোধন ও রোকেয়া স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ক্ষণে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। হলের অর্থায়নে প্রতিকৃতি স্থাপিত হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অকৃত্রিম সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। চারদিকে ধর্মান্ধরা যখন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য ভাঙার মহোৎসব করছে তখন নারী রোকেয়ার প্রতিকৃতি স্থাপনে অনুমতি প্রদান করে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুস সোবহান, নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়ে সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা এবং উদ্বোধনের সম্মতি দিয়ে বর্তমান মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল শ্রদ্ধার প্রণতি। গ্রন্থের প্রকাশ ও মোড়ক উন্মোচনে সহকর্মী ড. হোসনে আরা, ড. গোলাম রাশেদ, ড. মনি কৃষ্ণ মহন্ত, ড. তানিয়া তহমিনা সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এ আয়োজন অসম্ভব ছিল, তাদের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। এছাড়া প্রফেসর মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, প্রফেসর রবিউল ইসলাম, ড. রওশন জাহিদ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সবসময় অকৃপণ ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রচ্ছদ করেছেন ড. বনি আদম। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতায় স্মরি।

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়ার দেখানো স্বপ্নে বাঙালি নারী এগিয়ে যাক, স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর জীবনে অবরোধের কালো ছায়া নেমে না আসুক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ নর-নারীর যৌথতায় নির্মিত হোক। জয় হোক নারীর, জয় হোক বাঙালির। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোবার্‌রা সিদ্দিকা
প্রাধ্যক্ষ
রোকেয়া হল

সূচিপত্র

সনৎকুমার সাহা
বেগম রোকেয়া ও আমরা ১৩

অরুণ কুমার বসাক
বেগম রোকেয়া : মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত ১৯

মোবার্‌রা সিদ্দিকা
রোকেয়া ও নারীবাদ ২৪

সন্ধ্যা মল্লিক
নারী প্রসঙ্গে রোকেয়ার প্রত্যাশা ৩৬

হোসনে আরা খানম
রোকেয়ার নারী ভাবনা: পদ্মরাগ ৪১

তানিয়া তহমিনা সরকার
রোকেয়ার অর্থনৈতিক ভাবনা ৪৫

রিফাত সুলতানা
প্রত্যাবর্তন ৪৯

ফারজানা শারমিন
ঘোর ৫০

রোকেয়ার জীবনী ৫১

হল পরিচিতি ৫৩

প্রাধ্যক্ষ পরিচিতি ৫৭

বর্তমান প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ ৫৯

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আলোকচিত্র ৬০

হলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ৬২

বেগম রোকেয়া ও আমরা

সনৎকুমার সাহা*

বাংলায় নারী জাগরণ ও নারী মুক্তি সংগ্রামে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম বেগম রোকেয়া। অবদান তাঁর আপন কালের সীমা ছাড়ায়। নারীমুক্তি- ভাবনা অবশ্য এখনও অনেকটাই অচরিতার্থ। মানব-মানবীর যৌথ উদ্যোগ কল্যাণকামী হলেও সব সময়ে সমলয়ে আসে না। পেছনে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস তার ধারাবাহিকতাতে উচিত অনুচিতের যে অবকাঠামো তৈরি করে তার ভেতরে আচার-আচরণে আনুগত্যের অভ্যাস অনেকাংশে বিশ্বাসের আকার নেয়। শুরু থেকেই পরিপূরকতার পাশাপাশি প্রভুত্বকামিতার বীজ থেকে যায়। তারা মরে না। বাস্তবে জীবনযাপনের রীতি-নীতিতে মিশে গিয়ে পরিপুষ্ট হতে পারলে সুযোগমতো পারিপার্শ্বিকের প্রশ্রয়ে সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে আরো অনেক ডালপালাও ছড়ায়। তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিধি-বিধানের নামাবলি একবার রচিত হলে তার মৌরুসি পাট্টা সহজে ঘোচে না। বিশ্বাসই নিয়মশৃঙ্খলার প্রাথমিক নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবে কর্মপ্রবাহে নতুন নতুন তাগিদের সঙ্গে সঙ্গতি হারালেও তা বহাল তবিয়তে বলবৎ থাকতে চায়। এবং তার পেছনে সামাজিক ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংগত কায়েমি স্বার্থ আপনার দখল বজায় রাখায় বিরতিহীন তৎপরতার অনিবার্য নিদর্শন হয়ে ওঠে। কল্যাণ ও শুভচেতনার অনপেক্ষ কোন ধারণা নেই। প্রায়শই এমন ঘটে যে চূড়ান্ত বিচারে যা অন্যায় অথবা প্রগতির অন্তরায়, তাকেই গণমানুষ আবেগাশ্রয়ী সমর্থন জানায়। অতীত সংস্কারের পান থেকে চুন খসে না। কখনো বা বহিরঙ্গে চুনকামে মন ভোলে, কিন্তু মন জাগাবার কার্যকারণে গতি আসে না। তারপরেও পথ চলায় বিরাম নেই। দেখে শেখা, ঠেকে শেখা, অথবা, কিছুই না- শেখা, এসব নিয়েই আমরা নিজের কথা, এবং সবার কথা মাথায় রাখি। বেগম রোকেয়ার অবদান, তার সার্থকতা ও অপরিপূর্ণতা, এগুলো নিয়ে ভাবতে গেলেও কালের ওই "যাত্রার-ধ্বনি" কতটা শুনি, কেমন শুনি, কীভাবে তিনি এর সঙ্গে মেলেন, এর তাগিদই বা কেমন-কতদূর, এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি আমাদের হতেই হয়।

বেগম রোকেয়ার কাল সন তারিখ ধরে আজ অতীতের সঞ্চয়। ১৮৮০তে জন্ম। দীর্ঘজীবী তিনি নন। ১৯৩২-এ জীবনাবসান। প্রায় নয় দশক তারপর বিগত। উথাল-পাথাল অস্থিরতা এই সময়ের ফসল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ক্রমশ বাড়ে। কিন্তু তা বহুমত বহুপথে বিদীর্ণ। চূড়ান্ত লক্ষ্যেও বিভাজনের ফাটল ক্রমশ প্রকট। কী হব, কী করবো, কীভাবে হব, কীভাবে করবো এ সবেও দেখা দেয় নানা মুনির নানা মত। সময়ের অভিঘাতে আন্দোলিত গণমানুষ। আপন আপন বিশ্বাস ও অবস্থান থেকে তারা সাড়া দেয়, সমর্থন জোগায়, সক্রিয়ও হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দখল চায় নিজ নিজ পথে একাধিক মত ও দল। মূল লক্ষ্যও স্বাধীনতা-সংগ্রামের তলদেশে থাকে তাই পারস্পরিক অবিশ্বাস-হিংসাও তা থেকে প্রশ্রয় পায়। মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের বিবিধ, কখনও বা বিশ্বাসের আনুগত্যে পরস্পর বিরোধী, উদ্যোগ-অভিযান সমূহ বিপর্যয়কেও প্রশ্রয় দেয়, দিয়ে চলে।

বিশ্ব-বাস্তবতাও মানব-বিধ্বংসী বিপর্যয়ে ইন্ধন জোগায়। তিরিশের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা আমাদের উপনিবেশিত ক্রিয়াকর্মেও হানা দেয়। অনেকেই আমরা মূল কারণ নিয়ে তখন ভাবি না। কিন্তু সংকুচিত কাজের বাজার যখন আরো সংকুচিত হয়, তখন প্রতিক্রিয়ায় উপযুক্ত হয়েও কাজ না পেয়ে প্রতিযোগিতায় পরস্পর কামড়াকামড়ি করে ঘৃণা ও বিদ্বেষকে উৎকট বাস্তবে পরিণতি দিয়ে তারই পিঠে সওয়ার হয়ে স্বার্থোদ্ধারের পথ খুঁজি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিস্থিতিকে বিকট করে তোলে। ফসল ভালো হলেও সরকারি নির্দেশে বাজার থেকে সৈন্যদের জন্য বিপুল পরিমাণে অধিগ্রহণ করায় খাদ্যশস্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। একই কারণে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ঠেকাবার অজুহাতে নদীপথে ব্যবহৃত নৌকা সব ডুবিয়ে দেবার অথবা তাদের

*প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী

চলাচল নিষিদ্ধ করার ফলে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের রুজি রোজগারের নিয়মিত যাতায়াত-পথ আর প্রায় কিছুই খোলা থাকে না। দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায় না। ১৩৫০-এর (খৃ.১৯৪৩) মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ অসহায় মানুষ প্রাণ হারায়। এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। কিন্তু পাশাপাশি পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস বাস্তবের উস্কানিতে দেশভাগ অনিবার্য করে তোলে। ১৯৪৭-এ জন্ম নেয় দুই স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৭১এ পাকিস্তানের পূর্বখণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

রক্ত লাঞ্ছিত মুক্তিসংগ্রামে বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বেগম রোকেয়ার উত্তরাধিকার বর্তায় প্রধানত এই বাংলাদেশে। যদিও তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে গোটা উপমহাদেশ। তার প্রেক্ষাপট ছিল এর সবটাই। অবশ্য কর্মফল বিস্তৃত ছিল বাংলাভাষী সব অঞ্চলে। সরাসরি তখনকার প্রধান নগর কলকাতায়। এদিক থেকে তার গৌরব বহন করার প্রাথমিক অধিকার দাবি করতে পারে সব বাঙালিই। এবং এক জোতির্ময় আলোকশিখা তিনি হয়ে উঠতে পারেন বিশ্বের সব মানব-মানবীর সামনেই।

এতসব টালমাটাল কাণ্ডের পর, যার অনেকটাই বৈনাশিক এবং বিশেষ করে শ্রেয় ভাবনায় নিরুৎসুক, এমনকি প্রত্যাখ্যানমুখর, আমরা যে বেগম রোকেয়ার নারী-কল্যাণ এষণাকে উপেক্ষা করতে পারি না, এমন কি আগের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী থাকি, তার কারণ সম্ভবত, মানব-বাস্তবতার প্রাথমিক পাঠেই এর অপরিহার্যতার স্বীকৃতি এবং একই সঙ্গে অধিকাংশ সমাজ নির্মাণেই এই বিষয়ে ক্ষমতা বলয়ের সীমাহীন ঔদাসীন্যে আমাদের অন্তর্গত উদ্বেগের বিপরীতমুখী চাপে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাওয়া এমনটি নিয়েই আমরা বাঁচি, কিন্তু নিশ্চিন্ত বোধ করি না। মানব-মানবীর সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাই নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। যদিও জানি, সরষের ভেতরেই ভূত বাসা বেঁধে থাকতে পারে। আকাঙ্ক্ষাও হতে পারে সমাজবাস্তবতায় নানাবিধ জটিলতার সমাহার। এবং ওই বাস্তবতায় থাকতে পারে বহুস্তরের সমাবেশ আমরা বেগম রোকেয়ার অবদান স্মরণ করি এই সব নিয়ে। কোন কোন মহলের অন্তর্গত বিদ্বেষকেও সঙ্গী করে।

বেগম রোকেয়ার জন্ম এই বাংলার উত্তরখণ্ডে পায়রাবন্দ গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে। ওই সময়ে অমন পরিবারে আভিজাত্য কিন্তু গণমানুষের আচরণের সঙ্গে একটা দূরত্বও তৈরি করে। ইতর জনের, বিশেষ করে নারী সমাজে, চলা-ফেরার যে স্বাধীনতা – কোথাও বা বনেদি বাড়িতে দাসীবৃত্তির মূল্য দিয়ে কেনা এবং বাহ্যত ঘৃণার ও অবহেলার নিদর্শন – তা সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছিল অকল্পনীয় অশালীনতা। পর্দা প্রথার অবরোধ মনে করা হতো সামাজিক মর্যাদার স্মারক। বৃহৎ যৌথ পরিবারে ছেলে-মেয়েদের একত্রে সহজ-সাবলীল বেড়ে ওঠাকেও কড়া হাতে দমন করা হতো এই বলে যে তা বেইজ্জতি কারবার। নবাব বাদশা আমলের আচরণের ঐতিহ্য মিশেছিল আদর্শ জীবনযাপনের সূত্র রচনায়। বনেদি বংশ বা পরিবারের ইজ্জত রক্ষায় ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখায় তার গুরুত্ব খাটো করে দেখার কোন উপায় ছিল না।

আরো একটা ব্যাপার ছিল। অন্দরমহলের ভেতরে-বাইরে বাংলা ভাষার চল থাকলেও মনে করা হতো তা অগৌরবের। অনেক বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় মানুষের ব্যবহারিক ঘরোয়া জীবনে এ লক্ষণ এখনও বহমান। যদিও তার বিলুপ্তি ঘটাই সংগত ও স্বাভাবিক। কিন্তু বেগম রোকেয়ার জীবনকালে এবং সাতচল্লিশে পাকিস্তান হবার কালেও এখানে অভিজাত তন্ত্রের বাংলা ভাষা নিয়ে হীনমন্যতা ও উর্দু-বাত্‌চিতে অন্তর্জাত গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। তারই প্রতিফলন ঘটে আটচল্লিশে পাকিস্তানের জাতীয় সাংগঠনিক সভায় ও বাহান্নোয় পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলার গুরুত্ব অস্বীকার করে উর্দুকেই রাষ্ট্রের একমাত্র ব্যবহারিক ভাষা করার পক্ষে তখনকার এদেশীয় প্রভাবশালী চক্রের সংঘবদ্ধ সমর্থন জানানোয়। বেগম রোকেয়ার অবদান অনুধাবনের জন্য প্রেক্ষাপটের এই দিকটা মনে রাখা জরুরী। আরো এই কারণে যে, তার উত্থান এই অভিজাত-অন্ত্রের ভেতর থেকেই বাইরের আম-জনতার সমর্থন নিয়ে নয় যুগের প্রতিনিধি তিনি অবশ্যই। তবে লড়াইটা তার একলার। এবং সার্বিক বিচারে তা পুরোপুরি চরিতার্থ, একথা বলার মতো পরিস্থিতি এখনও অবর্তমান। যদিও প্রত্যক্ষে সংখ্যা গণনায় অর্জনের

পাল্লা যে আগের তুলনায় অনেক ভারী, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপরেও বৈষম্যের ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় সমাজে নারীর অসহায়তা কমেছে এবং এই সমাজ মানব-মানবী সবার জন্যেই আরো বাসযোগ্য হয়েছে, একথা বলার আগে একাধিকবার ঢোক গিলতে হয়। অবশ্য বেগম রোকেয়ার অবিস্মরণীয় কীর্তি তাতে ম্লান হয় না।

যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম, তাতে ওই সময়ের উগ্র রক্ষণশীলতার সব উপাদানই ছিল যথেষ্ট। এ সবই আগে থেকে সাজানো। কোন প্রশ্ন তোলা শুধু অনর্থকই নয়, চূড়ান্ত বেআদবীও। বেগম রোকেয়া এসবের সঙ্গে সমঝোতা করেই বড় হয়েছেন। ওই পর্বে কোন বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়াননি, সব কিছু মানসিকভাবে অনুমোদনও করেননি। তবে তার মতামতে কিছুই আসতো-যেতো না। কারণ সংসারে মেয়েদের ভূমিকা ছিল ছকে বাঁধা-পূর্ব নিধারিত। এবং তার পরিসর ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ। শিক্ষা কার্যত বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরে ছিল আবদ্ধ। সেখানে মেয়েদের সহবৎ চর্চাই প্রধান। পর্দা প্রথায় তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো এবং সবটাই বিবাহোত্তর জীবনে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনের অভিমুখী। কোন প্রশ্ন করা বা বিচার করা নয়, বরং সংস্কারের বেড়াজালে প্রতিটি নির্ধারিত নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলার ওপরই পড়ে সবটুকু জোর। জবরদস্তিও বাদ যায় না। এসবই বংশমর্যাদার সাথে খাপ খাওয়ানো। প্রধান উদ্বেগের বিষয়, মেয়ে তার শরাফত মেনে শ্বশুরবাড়ির বাড়ির চাহিদা সব মেটাতে পারে কি না। পড়াশোনা অহেতুক শখ মেটাবার ব্যাপার মাত্র। অবশ্য ধর্মগ্রন্থ ব্যতিক্রম। কারণ তার বিধান চূড়ান্ত। মেয়েদের অধস্তনতাও তার ফলে একরকম স্বতঃসিদ্ধ। বেগম রোকেয়া এসবের সঙ্গে খাপ খাইয়েই বড় হয়েছেন। তবে পরে যে তিনি তার সদাজাগ্রত উৎসুক ও প্রতিবাদী মনের স্বাক্ষর অবিনশ্বর রেখে যান, তাতে এ অনুমান হয়ত অসংগত নয় যে, প্রশ্নগুলো নিয়ে তার ভাবনার সূত্রপাত প্রাক বিবাহ পূর্বেই। পরে উপযুক্ত পরিচর্যার সুযোগ পেয়ে তার জন্মগত শানিত মনীষা তাদের মুখোমুখি হয়েছে। আপসহীন সততায় তিনি তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেকে অপমানিত করেননি।

বেগম রোকেয়ার বিয়েতে নাটকীয় কিছু ছিল না। যদিও আপাতদৃষ্টে অসামঞ্জস্য একটা মানা হয়েছিল, যা কোন বির্তকের সৃষ্টি করেনি। হয়ত এখনও করে না। বিষয়টা হলো, পাত্র সাখাওয়াত হোসেন দোজ-বর। এবং পাত্রীর সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান বিপুল। কিন্তু কুলগৌরবে তিনি অনেক ওপরে। পারিবারিকভাবে সামাজিক অবস্থানেও। বিশেষ করে চোস্ত উর্দুভাষী হওয়া তার একটা সূচক। তাছাড়া বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট। কনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখানে কোন ব্যাপার নয়। তার সুখ শান্তির সম্ভাবনার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সামাজিকভাবে পাত্রীপক্ষের গরিমা কতটা বাড়ে তার বিবেচনা এবং সেইটিই চূড়ান্ত। শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের মানিয়ে নেবার দায়িত্ব পুরোটাই তার। বাকিটা অদৃষ্ট। মূলে অবস্থাটা বোধহয় তথাকথিত ভদ্র সমাজে এখনও এই রকমই। অভিভাবকদের মতই কন্যার মত, এমনটিই ওই সমাজে সাধারণভাবে অনুমোদিত ও মান্য। মেয়ের পছন্দ কোথাও গুরুত্ব পেলেও তা অভিভাবকদের সম্মতির অপেক্ষায় থাকে। এবং ওই সম্মতি প্রচলিত সামাজিক মূল্যমানের মুখাপেক্ষী। কোন ব্যতিক্রম সেখানে উৎসাহ পায় খুব কমই। তবে মজার ব্যাপার, এই বিয়েই বেগম রোকেয়াকে গ্রাম্য সংস্কারে আভিজাত্যের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিক নাগরিক বাস্তবতায় আপন সুপ্তপ্রতিভা বিকাশের পথে একরকম হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। হয়ত ধরাবাঁধা নারীজীবনের সব প্রত্যাশা পূরণ হয় না। কিন্তু যা তিনি হতে পারেন, তা তাঁকে কিংবদন্তি নায়িকার প্রাতঃস্মরণীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এ নায়িকা নারী জাগরণের। সম্ভাবনাময় জীবনের রুদ্ধদুয়ার যতটা পারা যায়, খুলে দেবার।

আর পাঁচটা মেয়ের মতো বেগম রোকেয়াও সম্ভবত এই বিয়ে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। এতে ব্যতিক্রম কিছু ছিলো না। তবে যে কোন সময়ের প্রেক্ষিতেই অপ্রত্যাশিত ছিল স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সদিচ্ছা ও সংবেদনশীলতা। বয়সের বিরাট তফাত। অনুমান, তিনি রোকেয়াকে জীবনসঙ্গিনী বা গৃহিণী করার চেয়ে তাঁর মানসিক বিকাশের দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন। রোকেয়ারও ঝোঁক ছিল এইদিকে। সেই সঙ্গে অতুলনীয় মেধা। বাংলা জানা তাঁর কোন বাড়তি গুণ ছিল না। কিন্তু এই ভাষাতেই মননশীলতার বিকাশে যে সুশৃঙ্খল চর্চা

ও চিন্তার কর্ষণা আবশ্যক, তা তিনি পেয়ে যান স্বামীর উৎসাহেই। যদিও তাঁর প্রথম ভাষা ছিল উর্দু। ইংরেজি শেখাতেও রোকেয়া যথোপযুক্ত প্রণোদনা পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। এ শুধু পড়ে বোঝার মতো নয়, স্বাধীন ভাবে নিজের জটিল বক্তব্যও প্রকাশ করার মতো। এতে তার সক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পরে তার কোন কোন বিখ্যাত রচনার প্রথম পাণ্ডুলিপি দাঁড়ায় ইংরেজিতে। পরে তার অনুবাদ লেখেন বাংলায়। দুদিক থেকেই প্রকাশের যৌক্তিক কাঠামো তার দৃঢ়তর হয়। ভাষা প্রাঞ্জল এবং গদ্য নির্মেদ হয়েও মজবুত ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন। আজ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের তালিকায় প্রথম সারিতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। যদিও কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। স্বামীর প্রেরণার ভূমিকাই এখানে প্রধান, যেখানে তিনি নিজে মূলত বাংলাভাষী ছিলেন না। সব মিলিয়ে বেগম রোকেয়ার গদ্যে এমন এক আত্মনিষ্ঠার ছাপ মেলে, যা সম্পূর্ণত স্বতন্ত্র। কোনভাবেই তা নমনীয় নয়। তার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াই সম্ভবত তাঁরও গদ্যে এক নিরাবেগ-নাগরিক মহিমা দিয়েছে।

তবে বেগম রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এবং তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্য তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি। ফলে তার মননভূমিতে কর্ষণা অক্ষুণ্ন থেকেছে। আরো যা উল্লেখযোগ্য, তাঁর রচনায় নৈর্ব্যক্তিকতা ও বিষয়মুখিনতা আরো স্পষ্ট হয়েছে। নারীমুক্তি যেখানে তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, সেখানে কোন আবেগকে তিনি তাঁর যুক্তির পক্ষে এতটুকু প্রশ্রয় দেননি। বাংলায় যারা লেখেন, অতীত অথবা বর্তমান, তাঁদের ভেতর এই বিশেষত্বটি অতি বিরল। সম্ভবত তাঁর অবস্থানই তাঁকে এমন নিরাসক্তি দিয়েছে। তিনি নারীবাস্তবতাকে তাদের একজন হয়ে ভেতর থেকেই দেখেছেন। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের অন্তর্জালে আবদ্ধ নারীর আবেগ, সংস্কার বা পিছুটান তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেনি। ফলে তাঁর রচনা ও কর্মকাণ্ড কোন কায়েমি স্বার্থের অনুসারী হয়নি। অনাচ্ছন্ন দৃষ্টির নির্মাল্য তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি। সার্বিক শুভচেতনা সাংসারিক সুখের প্রলোভনের কাছে পরাস্ত হয়নি। ওই সুখেরও একটা মোহ আছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের কুহকে অথবা তাৎক্ষণিক স্বপ্নমায়ায় বার বার তা মানবী সত্তাকে জড়ায়। তিনি তাতে প্রলুব্ধ হননি। কিন্তু কাছে থেকে তার স্বরূপ চিনেছেন। আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কী করে সামনে এগোন যায়, তার পথ খুঁজেছেন। এই খোঁজার বার্তা সব নারীকে শোনাতে চেয়েছেন। পুরুষদেরও। কারণ পুরুষতান্ত্রিকতার একাধিপত্য যে গোটা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে তাদেরও পেছনে টানে, এটা জানা তাদের জন্যেও জরুরী। মানব-মানবীর পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাই গোটা সমাজকে, প্রকৃত অর্থে সুখ, শান্তি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মুক্ত মন ও মুক্ত জ্ঞান অবশ্য প্রাক-শর্ত।

'মতিচুর', *'সুলতানার স্বপ্ন'*, *'পদ্মরাগ'*, *অবরোধবাসিনী'* এগুলো বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। এদের ভেতর 'মতিচুরের' কিছু কিছু রচনা প্রথমে ইংরেজিতে লেখা, পরে অনুবাদ বাংলায়। *সুলতানার স্বপ্ন*ও সবটা এমন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বাঙালি লেখকের এমন দক্ষতা বিরল। সত্য, বঙ্কিম ও মাইকেল প্রথমে ইংরেজিতে লেখা শুরু করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার অসারতা অনুধাবনে তাঁরা বেশি সময় ব্যয় করেন না। ভাষা ও রচনার প্রকৃতিগত যোগসূত্র না থাকলে সাধারণত সৃষ্টিশীল কোন লেখা প্রাণের সম্পদে উদ্ভাসিত হয় না। রোকেয়ার গদ্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিশীল রচনা নয়। তা প্রত্যক্ষদর্শী, তর্কপ্রিয় ও যুক্তিনির্ভর। এতে প্রথমে ইংরেজিতে বক্তব্য খাড়া করায় নির্মাণশৈলী অনেক সময় যথাযথ ও মজবুত হয়। বাংলায় রূপান্তরে ভাবনা শৃঙ্খলা একই রকম অনুসৃত হলে তার সংহতি বজায় রাখা কখনো কখনো বেশি কার্যকর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। (অবশ্য উত্তর-আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক হুঁকোমুখো ওপর-চালাক চটকদাররা একমত হবেন না; যদিও তাঁদের অনেকেই বাংলা রচনার পূর্বাবস্থায় খসড়ানোট এভাবে সাজিয়ে নেওয়ায় অভ্যস্ত।) সে যাই হোক, বাংলা গদ্য রচনায় তাঁর নিজস্ব কণ্ঠ আমরা শুনি। তা অভিনব, পরিশীলিত ও সম্ভ্রান্ত। মূলে থাকে নারী জাগরণের আকাঙ্ক্ষা। তাঁকে নামতে হয় তাঁর জন্য সংগ্রামী ভূমিকায়। প্রতিপক্ষের অবস্থান লক্ষ করে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতায় তিনি তাঁর ভাষাকে তাঁর উপযোগী করে তোলেন। কিন্তু কোথাও সুরুচি ক্ষুণ্ন হয় না। প্রসাদগুণ তার এখনও অম্লান।

কোথাও কোথাও আজকের প্রেক্ষিতেও তাঁর বক্তব্য বৈপ্লবিক। প্রশ্ন তোলেন তিনি সব ধর্মগ্রন্থে নির্দেশবাণীর সারমর্ম নিয়ে। এমনটিও বলেন, সব ধর্মপ্রবক্তাই পুরুষ। সমাজে নারীর অবস্থানও তাই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে হয়ে যায় ঈশ্বর আদিষ্ট বিধিনিষেধে বন্দি। আক্ষেপ করেছেন, কোন ধর্মপ্রবক্তা নারী নয় কেন, এই বলে। আজকের পৃথিবীতেও একথার পুনরুচ্চারণ কোথাও কোথাও প্রাণসংশয় ডেকে আনতে পারে।

কিন্তু বেগম রোকেয়া ভয় পাননি। স্বামীর মৃত্যুর পর তার প্রেরণা ও স্মৃতি পাথেয় করে একক উদ্যোগে সমাজ-সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি তার সবশক্তি নিয়োগ করেন। যথার্থই তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েদের গৃহবন্দি রেখে কোন সমাজই সামনে এগোতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে পিছিয়ে পড়াই কোন দেশ বা জাতির অনিবার্য ভাগ্য লিপি। দুটো মিলিয়ে মেয়েদের জন্য মানসম্মত উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; বিশেষ করে নিজেদের সেই সমাজের কথা মনে রেখে, যেখানে নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের বাইরে অন্য কিছু পড়ায় নিরোধের অচলায়তন অনড়-এইটিই হলো তাঁর জীবন যাপনের ও জীবন সংগ্রামের লক্ষ্য। আর, সব মিলিয়ে নারী জাগরণের বস্তুগত প্রেক্ষাপট ও কার্যকর রূপ খোঁজা হয়ে উঠল তাঁর লেখালেখির মূল উপজীব্য। তাঁর একক সাধ্যে যতটা সম্ভব, তিনি তাঁর সবটাই করেন। কলকাতায় স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল। বাস্তব বুদ্ধি তাকে যথার্থই বোঝায় মফস্বলে ওই সমাজের ভেতর থেকে এমন কর্মকাণ্ড হাতে নেবার সময় তখনও আসেনি। কলকাতাতেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁকে জোগাড় করতে হয়েছে পড়ুয়া ছাত্রীদের, তাও এমন পরিবেশে, যেখানে অভিভাবকেরা এমন ভাব করেন, যেন স্কুলে মেয়েকে পড়ার অনুমতি দিয়ে তাঁরা তাঁকে করুণা করছেন। তিনি দমে যান না। স্কুল নিজের পায়ে দাঁড়ায়। আজ ত সে ইতিহাসের সাক্ষী এবং নারীর মুক্তি-সংগ্রামের স্মারক। সাধারণভাবে আজ অবশ্য মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় এ অঞ্চলে লক্ষণীয় কোন বাধা নেই। তবু নারী মুক্তির ঐতিহ্যের সন্ধানে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। বেগম রোকেয়ার নাম সেখান থেকে মুছে ফেলা যায় না। মেয়েরা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে অবশ্য আজ এগিয়ে গেছে আরো বহু দূর। যদিও সমাজের গভীরতর তলে ও বাস্তব আচরণে মানসিকতার প্রতিফলনে জীবনে হয়ে ওঠায় অর্জনে-বিসর্জনে পরিতৃপ্তি তাদের কতটা বেড়েছে, আদৌ বেড়েছে কি না, এসব নিয়ে কথা বলার অবকাশ যথেষ্ট তৈরি হয়েছে। তবে এদিকে দৃষ্টি দেবার আগে তাঁর প্রতিভার ততটা আলোচিত নয়, এমন একটা বিষয়ে দু-একটা কথা বলে নিই।

বেগম রোকেয়ার কবিতার হাতও ছিল পরিশীলিত ও বুদ্ধিদীপ্ত। নারী মুক্তি সংগ্রাম বা সমাজ-সংস্কারের কোন তাগিদ অবশ্য এমন সৃষ্টিতে মেলে কদাচিৎ। মনে হয়, কবিতা তাঁর অবসর-ভাবনার ফসল। গঠন কাঠামো গতানুগতিকই। কিন্তু তার ভেতরেও আভিধানিক ভারি শব্দের সঙ্গে চলতি শব্দ, বিশেষ করে ক্রিয়াপদের সুসামঞ্জস্য ব্যবহারে এমন এক গতিময় ভারসাম্যের সৃষ্টি করেছেন, যা নিশ্চিতভাবে অসামান্য। একে উপেক্ষা করা যায় না। তবে তাঁর সমাজভাবনা ও নারীজাগরণ মন্ত্রের উদ্বোধন যে ভাবে আমাদের মগ্ন ও কৃতজ্ঞ রাখে তাতে এদিকে আমাদের দৃষ্টি কদাচিৎ যায়।

এখন তাঁর কালে বেগম রোকেয়ার ব্যতিক্রমী ও তুলনাহীন অবদানের স্মৃতি মাথায় রেখে আজকের বাস্তবতায় তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, তা একটু বোঝার চেষ্টা করি। একথা মানতেই হয়, শিক্ষার অঙ্গনে কৃতজ্ঞ মানুষ তাঁকে ভোলেনি। ঢাকা বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনে তাঁর নামে কোন ছাত্রীনিবাসের নামকরণ প্রাথমিকতা পায়। পড়াশোনায় মেয়েদের শামিল করায় সার্বিকভাবে তাঁর মতো দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর আজ আর কাউকে টপকাতে হয় না। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আসনে নারী ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান নাগরিক অনুমোদনে স্বীকৃত। গণমানসও এতে অভ্যস্ত। খোলা আকাশের নিচে হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে নারী-পুরুষের পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া, কথা বলা কারো চোখ কপালে তোলে না। এ সব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, বেগম রোকেয়ার সব স্বপ্ন আজ চরিতার্থ। মেয়েরা আজ 'অবরোধ বাসিনী' নন। তিনি ও তাঁর বর্ণিত স্মৃতির অমূল্য সঞ্চয়

অবশ্যই। কিন্তু বাস্তবতা তাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর।

প্রেক্ষাপট বদলেছে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্বেও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত দ্রুত সমতার দিকে এগিয়ে আসছে। সাক্ষর জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাতেও একই ধারার প্রতিফলন। এবং সব মিলিয়ে সাক্ষরতার হার এখন শতকরা ৭০-এর ওপর। কিন্তু এসব তৃপ্তিদায়ক তথ্য কি আমাদের নিশ্চিন্ত করে যে নারীর মূল্য ও অধিকার সমাজে প্রকৃতই বেড়েছে? না কি উল্‌টো পিঠে তার অসহায়তাও একই সঙ্গে বাড়ছে? নারী-শিক্ষা ও শিক্ষার মূল্যবোধ, দুই-এর ভেতর ব্যবধান কিন্তু কমেনি। বরং নারী যত প্রত্যক্ষে আসছে, তত তার উপর আক্রোশ ও পাশবিক হামলা বেড়ে চলছে। আমাদের উদ্বেগ এতে কমে না। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষিত মানসিকতা গড়ে উঠছে না। বরং তা হয়ে উঠছে যারা দুর্বলতর, তাদের উপর ছড়ি ঘোরাবার একটা হাতিয়ার। সামাজিক মূল্যবোধে, এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে সাধারণভাবে মেয়েদের অধস্তনতা এতটুকু পাল্টায়নি। অনেক জায়গায় পুরুষতান্ত্রিকতার ছড়িটিও তুলে দেওয়া হয় মেয়েদেরই হাতে। 'পতি পরম গুরু' বা 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' এমন আপ্তবাক্য এখনও একইরকম প্রকটভাবে ঘরে ঘরে বিশ্বাসের মূলে কার্যকর। এবং তা প্রয়োগের কর্তৃত্বও বেশিরভাগ মেয়েদেরই হাতে। নারীমুক্তি অলীক স্বপ্নই বুঝি থেকে যায়।

সম্প্রতি ফেনীতে ঐতিহ্যবাহী উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনেই নুসরাত জাহান রাফি নামে এক অসহায় নিষ্পাপ ছাত্রী যেভাবে ওই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্ব-চক্রের নির্মম লালসার বলি হয়ে প্রাণ হারায়, তাতে আমরা শুধু বেদনার্তই হই না, অসহায় আক্ষেপে, নিজেদের কাছেই নিজেরা অপমানে লজ্জায় নতজানু হই। শিক্ষাও কি তবে মানুষকে পশু হতে ইন্ধন জোগায়? পেছনে কি থাকে দর্পিত ক্ষমতার প্রশ্রয়? রবীন্দ্রনাথ বহু আগে, ভর্ৎসনা করেছিলেন, "কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত! এ আমার এ তোমার পাপ"। আজকের এই নরক তো আমাদের পুঞ্জিভূত কৃতকর্মের পরিণাম।

বেগম রোকেয়ার শুচিস্নিগ্ধ নারীমুক্তি অভিযানের স্মৃতি বুকে নিয়ে তা থেকে ধারাবাহিক অর্জনের কথা মাথায় রেখেও শেষ পর্যন্ত তাই হতাশায় দীর্ণ হতে হতে বলি, 'কিছু ত হলো না। ক্ষমা করো।' জানি, এ যথেষ্ট নয়। সমাজগঠনের ঐতিহ্যের ভেতরেই রয়ে গেছে নারীর প্রতি অবহেলা। আর 'বীরভোগ্যা নারী"- এতো স্বতঃসিদ্ধ প্রবাদের মতো যুগ যুগ ধরে মানব মস্তিস্কের কোষে কোষে উৎকট তাড়না যুগিয়ে চলেছে। এখনও তার বিরাম নেই। তা আচ্ছন্ন করে এমন কি মেয়েদেরও পছন্দ-অপছন্দ। তারাও ত এই সমাজ বাস্তবতারই অংশ। তবু স্বপ্ন দেখার সাধ থেকে যায়। আর, প্রার্থনা করি, নারী-পুরুষ সবাই যেন আপন-আপন আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে আমৃত্যু বাঁচে। বেগম রোকেয়ার বুদ্ধিদীপ্ত সওয়াল ও নারী শিক্ষা অভিযান তার অতি আবশ্যক একটি ধাপ। কিন্তু শেষ ধাপ নয়। হয়ত অনেক পথ বাকি। কিন্তু পা মেলাবার দায় নিশ্চিতভাবে সবার।

(২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে বক্তব্যটি প্রদান করেন)

বেগম রোকেয়া : মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত

অরুণ কুমার বসাক*

আজ সারা দেশে 'রোকেয়া দিবসে' বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু দিবস গুরু-গম্ভীর পরিবেশে পালিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত এই হলে আমরা মিলিত হয়েছি তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে। বর্তমানে বাংলাদেশে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল, বহু শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, নারী সমিতি, পাবলিক ভবন, ঢাকার প্রধান রাস্তার নাম রোকেয়া সরণী তাঁর সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে অনন্য অবদানকারী নারীকে সম্মান করার জন্য বাংলাদেশে 'বেগম রোকেয়া জাতীয় পদক' চালু আছে। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস 'রোকেয়া দিবস' হিসেবে জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও সুফিয়া কামাল আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আজ আমরা যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, স্পিকার হিসেবে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, সমাজ সেবক সুলতানা কামাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. ফারজানা ইসলামসহ বহু নামকরা লেডি ডাক্তার, লেডি শিক্ষক, লেডি ব্যারিস্টার পেয়েছি (এবং আজ আমরা এখানে সম্মানিত শিক্ষিকা ও আমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করছি) তাও বেগম রোকেয়ার আজীবন সংগ্রামের ফসল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও বেগম রোকেয়াকে নিয়ে বহু গবেষণা ও লেখালেখি চলছে। ২০০৪ সালে বিবিসি পরিচালিত শ্রেষ্ঠ বাঙালির জরিপে বেগম রোকেয়া সর্বকালের ষষ্ঠ বিবেচিত হন। রবীন্দ্রযুগেও তাঁর রচনাসমূহ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং তিনি মুসলিম লেখিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন।

নারী শারীরিকভাবে দুর্বল ধারণার কারণে মানব-সভ্যতা বিকাশের পর থেকে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীর মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রমশালী হলেন মা দুর্গা। এর পিছনে দর্শন ছিল, মাতারূপে সৃষ্টির রক্ষাকারী নারীকে সম্মান করতে পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া। এতদ্সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় এবং রানি রাসমনি এর বহু সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল (বড়লাট) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে ১৮২৯ সালে মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্যান্ত বিধবাকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারার সতীদাহ প্রথাকে আইনগতভাবে রদ করা হয়। এর আগে মোঘল সম্রাট মহামতি আকবর সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হন।

এরপর রানি রাসমনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রচেষ্টাতে বিধবা বিবাহ আইন ১৮৫৮ সালে চালু হয়। বিদ্যাসাগর স্বীয় পুত্রের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের প্রথম বিবাহ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে, গরিব ঘরের সন্তান রানি রাসমনি (তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১১ বছর বয়সে) প্রথম হিন্দু নারী যিনি প্রবল সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে উচ্চ শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের অভাবে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে শ্বশুরবাড়ির জমিদারি পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন এবং প্রজারঞ্জনসহ জমিদারিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁর অনেক অবদানসহ নারীশিক্ষা প্রসারে তিনি বিশেষভাবে ব্রতী ছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগে 'জাহিলিয়াত'-এর সময়কালে মেয়েদেরকে যথেচ্ছভাবে অত্যাচার করা হত। ইসলাম ধর্মের বিধানে নারীদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আমরা জেনেছি, ১৯৩০ সালের পূর্বে গোঁড়া মুসলিম ও হিন্দুদের বাধার মুখে রাজশাহী কলেজে পুরুষ-মহিলার সহশিক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। শতাধিক বর্ষ পূর্বে কী করে বেগম রোকেয়া এত আধুনিক ও মুক্তিবুদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

*প্রফেসর ইমেরিটাস, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৮০ সালে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী জমিদার পিতা জহিরুদ্দিন আবু আলী সাবের-এর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মুসলিম নারীদের চার দেওয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনযাত্রা। তাঁর সহোদর দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তেন। আর তাঁর বড় বোন করিমুন্নেসা খানম ও তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল বাড়িতে আরবি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করা এবং কোরআন শরীফ পাঠ করা। সামাজিক বাধা-নিষেধের জন্য পুরুষ কেন, অপরিচিত মহিলার সম্মুখে আসাও নারীদের জন্য বেপর্দার সামিল ছিল তাঁর পিত্রালয়ে।

বেগম রোকেয়া শৈশবেই উপলব্ধি করেছিলেন, "নারী অধিকার আদায়ের পথ হল : (১) কার্যকর শিক্ষা এবং (২) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।" শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া বলেছেন, "(স্রষ্টা) ঈশ্বর যে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই কার্যকর শিক্ষা (পুঁথিগত মুখস্ত বিদ্যা, প্রকৃত শিক্ষা নয়) আমরা (মেয়েরা) বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইতেছে"। তাঁর আমলে পর্দার অর্থ অতিরঞ্জিত করে, নারীদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হত।

বেগম রোকেয়া কার্যকর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর দুর্দমনীয় আগ্রহ সহোদর ভাইদের নিকট ব্যক্ত করেন। তারা রোকেয়া ও বড় বোন করিমুন্নেসাকে বাংলা ও ইংরেজি শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশেষ করে, রোকেয়াকে তাঁরা বলতেন, "ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস তা হলে তোর সামনে এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলে যাবে"। গভীর রাত্রে বাড়ির সবাই নিদ্রামগ্ন হলে মোমবাতির আলোতে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের দুই বোনকে গোপনে বাংলা ও ইংরেজির পাঠ দিতেন। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত দেলদুয়ারের বিখ্যাত জমিদার গজনভী পরিবারে ১৪ বছর বয়সে করিমুন্নেসার বিয়ে হয়। পরবর্তীতে করিমুন্নেসা বাংলা-কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কলকাতার বাসায় রেখে রোকেয়াকে লেখাপড়ায় উৎসাহ যুগিয়েছেন।

রোকেয়ার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও আগ্রহের কারণে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। উল্লেখ্য যে, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম গোষ্ঠীর প্রবল বাধার মুখে তাঁর কলকাতার বাসাতে মেম সাহেবের কাছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। তাদের যুক্তি, মেম সাহেবের কাছে ইংরেজি শিক্ষা নেওয়া বেপর্দার কাজ। ১৮৯৮ সালে ১৮ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ভাগলপুরের অধিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮-১৯০৯)-এর সঙ্গে। তাঁর বৈবাহিক নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সাহিত্যিক জগতে তিনি এই নামে পরিচিত। তাঁর স্বামী উর্দুভাষী হলেও মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। তিনি রোকেয়াকে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখি করতে উৎসাহ দেন। এ কারণে বিয়ের পর রোকেয়ার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ালেখা পুরোদমে শুরু হয় এবং সাহিত্যচর্চার পথটাও সুগম হয়। ১৯০২ সালে 'পিপাসা' গল্প লিখে বাংলা সাহিত্য জগতে বেগম রোকেয়া আত্মপ্রকাশ করেন। এছাড়াও রোকেয়ার লালিত স্বপ্ন বুঝতে পেরে তিনি মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য কিছু অর্থ রোকেয়ার কাছে অগ্রিম গচ্ছিত রেখেছিলেন।

১৯০৯ সালে রোকেয়ার স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। দুই কন্যার বাল্যাবস্থাতে মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র অবলম্বন স্বামী হারিয়ে বেগম রোকেয়া মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও নারী জাগরণে রাজা রামমোহন, রানি রাসমনি ও বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করে তাঁদের অসমাপ্ত কাজ, বিশেষ করে অবরুদ্ধ মুসলিম মেয়েদের মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাকসভ্যতার যুগে নর ও নারী সমমর্যাদায় ছিল। মানব সভ্যতার আগমনের পর আধিপত্য বিস্তারের জন্য পুরুষ নানাভাবে নারীকে বঞ্চিত করতে শুরু করে। বেগম রোকেয়ার ভাষায়, 'পুরুষরা নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, নারীরা সেরূপ করিতে পারিল না। কালক্রমে পুরুষের সহধর্মিনী না হয়ে নারী দাসী হইয়া পড়িল'।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ/ছয় মাস পর স্বামী প্রদত্ত গচ্ছিত অর্থে বেগম রোকেয়া ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালে সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক ঝামেলা হওয়াতে তিনি কলকাতায় চলে

আসেন। অদম্য মানসিক বল ও অসাধারণ সাহস নিয়ে ১৯১১ সালে কলকাতায় ১৩, ওয়ালী উল্লাহ লেনের বাড়িতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' চালু করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোরআন শরীফে নির্দেশিত পর্দা ব্যবহার করে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবককে রাজি করাতেন। অভিভাবকের নিকট তাঁর কথা ছিল, 'মেয়েদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে যান, যাতে তারা সুগৃহিণী হতে সক্ষম হয় এবং যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করে'। বেগম রোকেয়া পত্র-পত্রিকাতে মেয়েদের পর্দা ও তাদের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' ১৯১৫ সালে ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে এক বড় বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৭ সালে বড়লাট-পত্নী লেডি চেমসফোর্ড স্কুলটি পরিদর্শন করেন। এরপর স্কুলের উন্নয়নের জন্য সহায়তা দিয়েছেন আগা খান, নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ. কে. গজনবী, শেরে-বংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ বড় ব্যক্তিবর্গ। বহু ধাপ পেরিয়ে ১৯৩০ সালে এটি ইংরেজি হাইস্কুলে পরিণত হলে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারী গার্লস হাইস্কুল' নামে স্কুলটি ১৩২, লোয়ার সারকুলার রোডে নতুন ঠিকানা পায়। তিনি আমৃত্যু স্কুলটির দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে। ১৯৩৮ সালে ১৭, লর্ড সিনহা রোডে স্কুলটি স্থায়ী ঠিকানা প্রাপ্ত হয়। ২০১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারী গার্লস হাইস্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

স্কুলটি গড়ে ওঠার সময় বিশেষ মুসলিম গোষ্ঠী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর বিরুদ্ধে চরম বিষোদ্গার শুরু করে। এতে তিনিও ঠাণ্ডা মাথায় পত্র-পত্রিকাতে সমুচিত জবাব দেন। তাঁর কথা, "স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে যদি স্বাধীনতা হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ হইবো। আমাদের কী হাত নাই, পা নাই, বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীগৃহ কার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কী স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিবো না?" এছাড়াও তিনি বলেছেন, "আমরা (নারীরা) যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবো। কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক"। বেগম রোকেয়ার বিপ্লবী স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

১৯১৬ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম বাঙালি নারীদের অগ্রগতির জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে মুসলিম মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা মুসলিম নারী-জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণের একটি কার্যকর ফোরাম যা বেগম রোকেয়ার অপর এক মহান কীর্তি। মুসলিম দরিদ্র ছাত্রীদের এবং অসহায় বিধবা মহিলাদের আর্থিক দীনতার অবসান করাও এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দু বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানী ছাড়িতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।" [মোহম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, আত্ম-অন্বেষায় বাঙালি মুসলমান]। বেগম রোকেয়ার অসাম্প্রদায়িকতার ভাবধারা আজ বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি। প্রকাশকালসহ এগুলি: (১) মতিচূর ১ম খণ্ড (১৯০৪), (২) Sultana's Dream (১৯০৮), (৩) মতিচূর ২য় খণ্ড (১৯২২), (৪) পদ্মরাগ (১৯২৪) এবং (৫) অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১)। (১) কোহিনূর পত্রিকার বৈশাখ, আশ্বিন ও মাঘ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যাতে প্রকাশিত মতিচুর ১ম খণ্ডের আলোচক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের দীর্ঘ আলোচনার বিশেষ অংশে উল্লেখ ছিল, "(এতে) ... ... দৃঢ়তা, গুরুত্ব ও শক্তি সঞ্চারিত (হয়েছে) ..... 'মতিচূর' সাহিত্য পূজায় অকৃত্রিম ....পুষ্পাঞ্জলি"।

(২) বিজ্ঞান ফিকশন (কাল্পনিক কাহিনী) ভিত্তিক ইংরেজি উপন্যাস Sultana's Dream। নিজের অনুদিত এর বাংলা সংস্করণ (ভাষান্তরণ) 'সুলতানার স্বপ্ন' মতিচুর ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বেগম রোকেয়া নির্ভেজাল নারী-শাসিত রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

(৩) মতিচুর ২য় খণ্ড বড় বোন করিমুন্নেসা খানমের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, রোকেয়াকে বাংলাভাষা শিখতে উদ্দীপিত করেছিলেন বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে। বড় বোনের উৎসাহে খ্যাতনামা ইংরেজ লেখিকা মেরি কোরেল-এর বিখ্যাত উপন্যাস Murder of Delicia এর বাংলা অনুবাদ করেছেন বেগম রোকেয়া। অনুদিত 'ডেলিসিয়া হত্যা' এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে অনুকূল চন্দ্র রায় লিখেছেন, "লেখক নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে নারীসমাজকে, বিশেষ করিয়া মুসলমান নারীদেরকে ....উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ...শিক্ষার গুণে আমাদের (নারীদের) মন ও আত্মা উন্নত ও প্রসারিত হয় .... (এবং আমরা) অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হইয়া উঠি"।

(৪) পদ্মরাগ গ্রন্থটি লেখিকা তার শিক্ষকতুল্য বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের-এর নামে উৎসর্গ করেছেন। নিবেদনে বড় ভাই কর্তৃক কথিত গল্পের মাধ্যমে সামাজিক অসাম্প্রদায়িকতার চিত্র লেখিকা উল্লেখ করেছেন। গল্পটি নিম্নরূপ: "..... ধর্মবিশ্বাসী মানুষ যখন উচ্চমার্গে আরোহন করেন তখন তিনি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি হিসাবে পার্থক্য দেখেন না, দেখেন সবাইকে মানুষ আর উপাস্য এক আল্লাহকে"। গ্রন্থের ভূমিকাতে অধ্যাপক বিনয় ভূষণ সরকার বলেছেন, ".... (লেখক আমাদের) সমাজের ক্ষতস্থানে... আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া... ব্যাধির সমাধানের... তিনটি মূলমন্ত্র (হিসেবে) উদার হৃদয়, আন্তরিক প্রেম ও প্রকৃত সহিষ্ণুতা... সমাবেশ (করেছেন)"। পদ্মরাগ একটি সামাজিক উপন্যাস। এখানে বেগম রোকেয়া বলেছেন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান পুরুষ শাসিত সমাজের নারীরা নিগৃহীত ও নির্যাতিত। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির ঔষধ উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া। অর্থনৈতিক মুক্তি নারীসত্তার বিকাশ সাধন করে।

(৫) অবরোধ-বাসিনী গ্রন্থটি লেখিকা তাঁর মাতা মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণীকে উৎসর্গ করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকাতে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল করিম বি.এ.এম.এল.সি লিখেছেন," ...অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লেখেন নাই।.... কোথায় বীরবালা (৭ম শতাব্দীতে নবীজি-আমলের হযরত) খাওলা (বিনতে আল-আযওয়ার...) এবং (১২৩৬ সালে দিল্লীর মসনদে বসা ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শাসক) রাজিয়া সুলতানা (১২০৫-১২৪০ খ্রি.) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহনপূর্বক পুরুষ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে কাল কাটাইলেন। ...অবরোধ-বাসিনী পাঠে... অনেকেরই (ঘুমন্ত নারীদের) চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে"।

এখানে আরব নারী-যোদ্ধা হযরত খাওলা বিনতে আল-আযওয়ার-এর বীরত্বের কাহিনি বলা আবশ্যক। তিনি আরবের 'রশিদুন সেনাদলে' থেকে সিরিয়া, জর্ডান এবং প্যালেস্টাইন দিগ্বিজয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। একবার তাঁর সহোদর ভাই দারার বিন আল-আযওয়ার রোমান-সেনা কর্তৃক বন্দি হন। আরব সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তখন সম্মুখ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছিলেন। হযরত খাওলা পিছন থেকে রোমানদের আক্রমণ করে ভাই দারারকে মুক্ত করেন। এতে সেনাপতি খালিদ বিস্মিত হন। হযরত খাওলা বিভিন্ন যুদ্ধে বহু বন্দি আরব-সেনাকে মুক্ত করেছেন। একবার হযরত খাওলা নিজেই বন্দি হন। রোমানরা তাঁকে রোমান সেনাপতির ঘরে নিয়ে গেলে তিনি সেনাপতিসহ ৩০ জন শত্রুসেনাকে হত্যা করে নিজ নারীত্বের মর্যাদা রক্ষাসহ পলায়ন করেছিলেন।

অবরোধ-বাসিনী গ্রন্থে, লেখিকা বেগম রোকেয়া অবরোধ-প্রথাকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রথম দেখিয়েছেন যে 'পর্দার' নামে অবরোধ প্রথা পশুসম মানবেতর জীবনযাপনের এক বন্দি-জীবন ব্যবস্থা। নারী-পর্দার এই অপব্যাখ্যা নারীশিক্ষাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে দীর্ঘকাল। মতিচুর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত

বোরকা প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, সম্ভ্রম রক্ষার্থে নারীর উপযুক্ত আবরণ প্রয়োজন। মুসলিম নারীদের জন্য উপযুক্ত পর্দা-ব্যবস্থা কোরআন শরীফের 'সূরা নিসা'-তে বর্ণনা করা আছে। বেগম রোকেয়ার মতে উপযুক্ত পর্দা পুরুষদের অহেতুক কৌতূহল প্রশমনের পন্থা। এটা অবশ্য জলবায়ু ও সংস্কৃতি নির্ভর। সুশিক্ষিত নারীরাই পারেন পরিবেশ অনুযায়ী পর্দার উপযুক্ততা নির্ধারণ করতে। পর্দা ও নারীশিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং পরস্পর পরিপূরক। পর্দা স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, (অ) আবরণ মস্তককে ধুলামুক্ত রাখে, (আ) রান্নাঘরে মাথার আবরণ খাদ্যদ্রব্যকে রোগজীবাণু মুক্ত রাখে এবং (ই) দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে শরীরকে রক্ষা করে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে অগ্রন্থিত ২৬টি প্রবন্ধ, ১২টি কবিতা এবং ৭টি ছোটগল্প ও রসরচনা। পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত এসব রচনার মাধ্যমে বেগম রোকেয়া নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর নর-নারীর সমতার পক্ষে সবল যুক্তি তুলে ধরেছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিভা বিকাশে তাঁর স্বামীর অসামান্য সহায়তা লাভ করেছেন। নারীশিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন মুসলিম মেয়েদের স্কুল নির্মাণের প্রাথমিক অর্থ স্বামী সাখাওয়াত হোসেনেরই দান। 'লুকানো রতন' প্রবন্ধটির উৎসর্গ-লিপিতে লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন, "স্বামী প্রতিকূল হইলে আমি কখনই সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না"।

মোবার্‌রা সিদ্দিকার [আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান..., বাংলা একাডেমী ঢাকা (জুন ২০০৭), ISBN 09807-46057] ভাষায়, "সাহিত্য জীবনের দর্পণস্বরূপ। জীবন হল মানুষের ... ভাব-চিন্তা-কর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস ও বৃত্তি-প্রবৃত্তির সমষ্টিগত রূপ। জীবনেরই বিচিত্রমুখী ঘটনাপ্রবাহ কবি-সাহিত্যিকের লেখনীতে মূর্তমান হয়ে ওঠে। পারিবারিক শান্তি রক্ষার্থে, জাতীয় ঐক্য আনয়নে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে শিক্ষিত মাতার অর্থাৎ সুগৃহিণীর ভূমিকা অপরিসীম। সুগৃহিণীর অর্থ মতিচুর ২য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সাহিত্যজগতে বেগম রোকেয়ার অনুপ্রবেশের মূল উদ্দেশ্য মুসলিম নারী জাগরণ এবং সমাজসেবা। তিনি নারীবাদী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বহুর মধ্যে একটাই তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য, নারী-জাগরণ ও নারীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের মাধ্যমে সমাজে নর-নারীর সমতা বিধান করা। তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে সমতা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দ্বিচক্র শকটের... (যদি) এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না...।"

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সাহিত্যিক ভাবুক ছিলেন, কিন্তু শুধু কল্পনা জগতে বিচরণ করেননি, বাস্তবতা নিয়ে তিনি সব রকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম গোষ্ঠী আমৃত্যু রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নাজেহাল করতে ছাড়েনি। এই গোষ্ঠী ১৯৩২ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁকে কলকাতা শহরের মুসলিম গোরস্থানে কবর দিতে দেয়নি। তাঁর সমাধিস্থল কলকাতা শহরের বাহিরে অবস্থিত সোদপুরে যা পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক অমলেন্দু দে আবিষ্কার করেন। ২০১১ সালে রংপুর জেলায় অবস্থিত মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামের জন্মভিটাতে ৩.৭৫ একর জমির উপর নির্মিত হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র। স্মৃতিকেন্দ্রটি পরিচালনা করছে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

উর্দুভাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং অবাঙালি ঐতিহ্যে জীবন কাটিয়েও বেগম রোকেয়া মননে ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। জীবনভর তিনি বাঙালি মুসলিম নারীদের অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁদেরকে মুক্তি-পথ প্রদর্শন করে গেছেন। মুসলিম সমাজের ঘুমন্ত বিবেককে জাগানোর অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে জানাই আমার প্রণতি।

(২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে বক্তব্যটি প্রদান করেন)

রোকেয়া ও নারীবাদ

মোবার্‌রা সিদ্দিকা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নারীবাদী, যিনি সামাজিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নারীর স্বাধিকার প্রসঙ্গে লেখালেখি করেছিলেন, বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছিলেন, বিধবা-অসহায় নারীদের উন্নয়নে নারী-সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। রোকেয়াকে আমরা সাধারণত মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত, নারীমুক্তির অগ্রদূত ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করি। কিন্তু তিনি যে একজন নারীবাদী ব্যক্তিত্ব সে বিষয়ে স্বীকার করতে বা বলতে আমাদের মানসিক জড়তা কাজ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান বাংলাদেশে অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসেও নারীবাদ কথাটি নঞর্থক ভাব প্রকাশ করে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষিত মহলেও এর প্রতি এক ধরনের অশুচিমূলক মনোভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো নারীবাদ সম্পর্কে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা। গতানুগতিক ধারণা হলো নারীবাদ হচ্ছে সকল প্রকার সামাজিক প্রথাবিরোধী নারীর পুরুষবিদ্বেষমূলক কার্যক্রম। যার কারণে শিক্ষিত মহলও শ্লেষপূর্ণ ফোঁড়ন কাটে, 'ওরা তো নারীবাদী।' এ মানসিকতার কারণে বৈশ্বিক নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে রোকেয়ার অবস্থান নির্ণয়েও আমাদের গবেষকদের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যযোগ্য। রোকেয়া কি নারীবাদী, না নারী মুক্তির পথিকৃৎ– এ জাতীয় জিজ্ঞাসাও উত্থিত হয়। নারীমুক্তির জন্য রোকেয়ার আজীবনের সংগ্রামকে সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেও তাঁকে নারীবাদী বলতে যেন সঙ্কোচ লক্ষ করা যায়। বর্তমান নিবন্ধে রোকেয়ার নারীবাদ তথা নারীবাদী কার্যক্রমের বৈশ্বিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে।

নারীবাদ আসলে কি বা নারীবাদী কারা এবং পুরুষ কি নারীবাদীর আওতায় পড়ে– ইত্যকার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যায়, বাস্তবিক অর্থে, নারীবাদ নারীদের কোন আন্দোলন নয়, নারীর অধিকারের জন্য মানবীয় আন্দোলন ও মতাদর্শ; এর অংশীদারিত্ব নর-নারী যৌথতায়। 'জেন্ডারকোষ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলা হয়েছে,"একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলন যা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে লিঙ্গসাম্য ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ। নারীবাদ একক , একচ্ছত্র মত নয়। বরং নানা মতের সম্মিলিত শক্তিতেই এর উদ্ভব ও বিকাশ"[১]। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নারীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়ে নানান মত ও আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে। এটি এমন একটি মতবাদ বা আন্দোলন, যেখানে মানুষ হিসেবে নারীর পরিপূর্ণ অধিকারের দাবি প্রকাশ পায় ও বাস্তবায়নের জন্য তদানুযায়ী কার্যক্রম গৃহীত হয়। বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি যা নারীকে অর্ধ-মানবী করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে মানবীয় সোচারকণ্ঠ, লেখালেখি, জনমত গঠন ও আন্দোলন করাই হলো নারীবাদ। এর সংজ্ঞায়নের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সাধারণত, সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় আগ্রহকে নারীবাদ বলা হয়। নারীবাদী গবেষক Rosalind Delmar তাঁর What is Feminism তে বলেছেন, Feminism is usually defined as an active desire to change women's position in society.[২] এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে নারীবাদী কারা – অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন এর মতে, "নারীবাদী সে, যে নারী শিক্ষা, নারী-অধিকার, ভোটাধিকার এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইন অধিকারের মাধ্যমে সমাজ-পরিবারে-রাষ্ট্রে পরিবর্তন সাধন করতে চান।"[৩] এ প্রসঙ্গে আরেক নারীবাদী গবেষক Olive Banks এর মন্তব্য হাজির করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, নারীবাদী হলো "Any groups that have tried to change the position of women, or the ideas about women and the great variety of ways in which they have tried to do this".[৪]

*প্রাধ্যক্ষ, রোকেয়া হল ও প্রফেসর ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নারীবাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যুগে যুগে বহু পুরুষ নারীর অধিকার, নিপীড়ন, বৈষম্য ও মুক্তি বিষয়ে লেখালেখি ও সামাজিক আন্দোলন করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করার জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, সমাজ রূপান্তরে লড়াইয়ে নেমেছেন, জনমত গঠন করেছেন, বক্তব্য প্রদান করেছেন, নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ-মনস্তত্ত্বে অভিঘাত সৃজনে তৎপর হয়েছেন। নারীবাদের সংজ্ঞায়নে তাঁরা সকলেই নারীবাদী। তাই নারীবাদ হলো একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ ও আন্দোলন, যার দ্বারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যমান নারীর গতানুগতিক ভূমিকার পরিবর্তন, লিঙ্গীয় বৈষম্য দূরীকরণ, নরের মতো নারীর সমান অধিকার অর্জন ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিদ্যমান থাকে। এটি একটি সামাজিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বটে। উপর্যুক্ত নারীবাদ ও নারীবাদীর সংজ্ঞানুসারে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও একজন নারীবাদী, যিনি সমকালীন আরব সমাজে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর আরবের অন্ধকারযুগে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন, মেয়েশিশুর জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথাকে রহিত করেছেন, পরিবারে সন্তানের নিকট পিতার উর্ধ্বে মায়ের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠার বাণী প্রচার করেছেন এবং পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার অংশীদারিত্বের দাবি তুলে ধরেছেন। এরকমভাবে কালে কালে বহু মহাত্মা সমাজে নারীর উন্নয়নে, নারীর অবস্থার পরিবর্তনে আন্দোলন করেছেন। এই ভারতবর্ষেরই অন্যতম মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীর শিক্ষার জন্য, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য লেখালেখি, স্কুল প্রতিষ্ঠা, আইন প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতাসহ নানা প্রকার সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও তেমনি নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অমানবিক ধর্মীয় কুপ্রথা সতীদাহ বন্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে সফল হয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশ তথা বাঙালি মুসলিম নারীদের সামাজিক হীন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রোকেয়ার পূর্বে নর-নারী নির্বিশেষে আর কাউকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। একমাত্র রোকেয়া নিজ গোষ্ঠীর মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক অবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন, যেখানে পুরুষতান্ত্রিকতায় নারী এমন কুপমণ্ডুকতায় নিমজ্জিত যা সে নিজেও বুঝতে পারে না এবং ব্যক্তিক চেতনা বা বোধ তৈরির সেই সুযোগও পরিবার ও সমাজ থেকে পায় না। তাই তিনি নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত সামাজিক-ধর্মীয় বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সচেষ্ট হন, লেখালেখির মাধ্যমে সমাজ-সচেতনতা তৈরিতে সক্রিয় পদক্ষেপ নেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিক জীবন-উপলব্ধি থেকে ব্যক্ত করেছেন নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ, চিত্রিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন নারীর দাসত্বের ও পুরুষের আধিপত্যের মনস্তত্ত্ব। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতিসৃষ্ট নারী নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাসমূহকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি নারী সমাজের সীমাবদ্ধতাকেও নির্দেশ করেছেন। কেন বাঙালি তথা ভারতীয় নারী মানবেতর জীবন-যাপন করে, এর কার্যকারণ নির্ণয়ে রোকেয়ার পর্যবেক্ষণ হলো 'সুযোগের অভাব'। সুযোগের অভাবে বাঙালি নারীর কার্যপরিসর সীমিত হতে হতে 'আলস্য' ও 'অকর্মণ্য' রূপে অসচেতন পরজীবী অর্থাৎ পুরুষনির্ভর হয়ে উঠেছে। এর ফলে, "... আমরা আলস্যের,– প্রকারান্তরে পুরুষের– দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে।"[৫] মানসিক অবনমনের এ রূপ নারী নিজেও বুঝতে অক্ষম। দীর্ঘকালের পরম্পরাগত কর্মকাণ্ডে নারী এমনই নিমজ্জিত যে, সেখানে তার মানব-সচেতনবোধ লুপ্ত। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণও রোকেয়া চিহ্নিত করেছেন,

> "বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিস্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই– এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না। তাই বলিতে চাই: "অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি"[৬]।

এ জাগরণ সম্ভব শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে, সেই শিক্ষা যা নারীকে মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। এতদসঙ্গে তাঁর শিক্ষা-দর্শনও তুলে ধরেছেন এভাবে,

> "ঈশ্বর আমাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎ কার্য্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি– তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।"[৭]

রোকেয়া তাঁর মননশীল লেখা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও বোধের জায়গাটিতে নাড়া দিতে পেরেছিলেন, সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তথাকথিত অবলা নারীরা শিক্ষা, সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে, সমাজের বাধা-গন্ডি পেরিয়ে তারা মানুষ হিসেবে স্বকীয় মর্যাদা লাভে সক্ষম ও সমর্থ। কিন্তু এদেশীয় সমাজ-মানসের চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তিনি বলছেন,

> "অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'।"[৮]

রোকেয়ার জন্মের শতবর্ষ পূর্বে ইংল্যান্ডের মেরী ওলস্টোন ক্রাফ্টও নারীর অধিকারের পক্ষে কলম হাতে নিয়েছিলেন। মেরীর গ্রন্থ বা লেখালেখি রোকেয়ার নজরে এসেছিল কি না আমাদের জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু যে কঠিন সামাজিক বাস্তবতায় ও অভিজ্ঞতায় মেরী নারী শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সেই একই প্রেক্ষাপটই রোকেয়ার বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। বলা যায়, যুগান্তরের চাকায় সমাজ, কাল ও স্থান পেরিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা পৃথিবীর সকল প্রান্তের নারীকে সম অভিজ্ঞতারই মুখোমুখি করেছে, তাই সচেতন নারীর পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন, প্রতিবাদ ও সমাধানের পথও সমরূপতা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে রোকেয়ার কৈফিয়তের ভাষা,"বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংল্যান্ড – সর্ব্বত্র হইতে একই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা।"[৯] বলা যায়, এই আধ্যাত্মিক একতা হলো পুরুষতান্ত্রিকতার শোষণের শিকার নারীর সম-অভিজ্ঞতা, যা তাদের প্রতিবাদের ভাষা বা সাহিত্য প্রকাশের মধ্যে ভগিনীত্বের (sisterhood) বন্ধন সৃষ্টি করেছে বা মানসিক নৈকট্য প্রদান করেছে।

'নারীবাদের জননী' বলে আখ্যাত অষ্টাদশ শতকের লেখক মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইটস অব ওম্যান' (১৭৯২) তে নারীর শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। শিক্ষালাভের মাধ্যমেই সকল প্রকার অধীনতা থেকে নারীর মুক্তি সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তাই তিনি নর-নারীর অভিন্ন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যদিও মেরী নারীর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। অষ্টাদশ শতকের নারীর যে হীনাবস্থা বিদ্যমান ছিল সেই প্রেক্ষাপটে তিনি নারী উন্নয়নে ও তার অধস্তন অবস্থা উত্তরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকারকেই একমাত্র বিবেচনায় নিয়েছিলেন। ফরাসি রাজনৈতিক নেতা ট্যালিরাঁদের নামে উৎসর্গ-বক্তব্যে তিনি বলেছেন,

> "Contending for the rights of women, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to become the companion of man, she will stop the progress of knowledge, for truth must be common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on general practice."[১০]

মেরী তাঁর গ্রন্থে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, দার্শনিক রুশো, জেমস ফোরডাইস, মাদাম গেনলিস, লর্ড চেস্টারফিল্ড, ড. গ্রেগরি প্রমুখ লেখকবৃন্দ নারী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁদের সাহিত্য, কবিতা বা প্রবন্ধে যা লিখেছেন বা বলেছেন সবই কুশিক্ষা এবং তা নারীকে আরো দুর্বল মানবী করে তোলে, যা নারীর বুদ্ধি, বিচারশক্তিকে লুপ্ত করে পুরুষভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করতে সহায়ক। তাঁর কথায়,

> "I may be accused of arrogance; still I must declare what I firmly believe, that all the writers who have written on the subject of female education and manners from Rousseau to Dr. Gregory, have contributed to render women more artificial, weak characters, than they would otherwise have been; and, consequently, more useless members of society."[১১]

মেরী যে সময় ইউরোপে পুরুষতন্ত্রের অধীনতা থেকে নারীর মুক্তির বিষয় নিয়ে যৌক্তিক পাটাতন তৈরী করতে লেখালেখি করছিলেন, তাঁর কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের এক মহামতি পুরুষ ভারতীয় নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে তত্ত্ব হাজিরের আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। তৎকালীন বাংলার সমাজ ছিল ধর্মীয় অনাচারে পূর্ণ, ছিলো ধর্মের নামে মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে জোর করে সহমরণে বাধ্য করার মতো অমানবিক প্রথা, আরো ছিল বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা ও বাবু সংস্কৃতির মতো মানসিক ও যৌনবিকৃতমূলক কর্মকাণ্ডে ভরপুর। যে সমাজে ধর্মশাস্ত্রের ও ফতোয়ারূপ ব্রহ্মাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, নিপীড়ন করা হচ্ছে, সেখানে রামমোহন রায় বেছে নিলেন সেই দেবভাষার শাস্ত্রকে, যার মধ্যে রক্ষিত সকল ধর্মাস্ত্রগুলো। ধর্মাস্ত্রসমূহের বাস্তবতা, সত্যতা ও স্বরূপ জানতে নিজেই দেবভাষাকে অনুবাদের মাধ্যমে নামিয়ে আনেন মানবের ভাষায়, শুরু করেছিলেন তিনি সংস্কৃত উপনিষদসমূহের বঙ্গানুবাদ। যার ধারাবাহিকতায় রাজা রামমোহন রায় ১৮১৮ সালে হিন্দু ধর্মীয় বিধান সতীদাহ প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে লিখেন সহমরণ বিষয়ে "প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ"; এ বিষয়ে তিনি পরপর তিনটি পুস্তিকা লেখেন কথোপকথনের ভঙ্গিতে, যেগুলো যথাক্রমে ১৮২০ ও ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি দীর্ঘযুগ ধরে প্রচলিত সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় ও নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করতে সক্ষম হন। সহমরণ যে শাস্ত্রীয় বিধান নয়– তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজীতে গ্রন্থ চয়ন করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নজরে আনেন এবং এতদসঙ্গে জনমত গঠনেও ভূমিকা রাখেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় ১৮২৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুদের প্রচণ্ড কোপের শিকার হয়েও রামমোহনের নারীবাদী কর্মকাণ্ড থেমে থাকে নি। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে এই রহিত আইনের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করে। যথারীতি রামমোহনও ইংল্যান্ডে গিয়ে ওই আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা আবেদন করেন। প্রিভি কাউন্সিল গোঁড়াবাদীদের আবেদন খারিজ করে দেয়ার মধ্য দিয়ে রামমোহনের প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করে এবং দীর্ঘযুগ ধরে প্রচলিত বিধবা হিন্দু নারীর প্রতি আরোপিত 'সতীদাহে'র নামে নিষ্ঠুর প্রথাটি রহিত হয়। এছাড়াও তিনি হিন্দু নারীর পিতার সম্পদে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং বহুবিবাহ প্রথা বন্ধে সরব ছিলেন। সমাজে যে নারীর সমানাধিকার প্রয়োজন, রামমোহন রায়ই প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন। ১৮২২ সালে "নারীদের প্রাচীন অধিকারের বর্তমান সঙ্কোচনের উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য" নামে একটি পুস্তক লেখেন। এতে নারীদের আইনানুগ অধিকার দেওয়া ও তাদের শিক্ষাদানের জন্য দাবি জানানো হয়। তাঁর রচিত সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' গ্রন্থেও নারীশিক্ষা বিষয়ে যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। নিবর্ত্তকের কথা (নিবর্ত্তক হলেন যিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে);

> "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়? লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী

> প্রভৃতি যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রে পারগ রূপে বিখ্যাতা আছে; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ী তাহা গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।"[১২]

এভাবে রাজা রামমোহন রায় ধর্মগ্রন্থকে, ধর্মীয় মিথকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করে উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজে নারীর অধিকার, শোষণ, বঞ্চনার দিকটি উপস্থাপন করে তার নারীবাদী কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছিলেন। বলা যায়, রামমোহনই প্রথম বাঙালি নারীবাদী পুরুষ, যিনি স্বসমাজের নারীর দুরাবস্থার বিরুদ্ধে যৌক্তিক অবস্থান নিয়ে লড়াই করেছিলেন। ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, অন্তত রামমোহনের আগে পৃথিবীর আর কোথাও নারীর পক্ষে কোনো পুরুষ কিছু লেখে নি, লড়াইয়ে নামে নি।[১৩] ভারতবর্ষের আরেক নারীবাদী পুরুষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি নারীর হীনাবস্থার প্রতি এমনই কাতর ও দয়ার্দ্র ছিলেন যে, তাঁর মানবিক কর্মযোগ ও সহমর্মিতাকে বাঙালি জননী মনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, The man to whom I have applied has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.[১৪]

আমৃত্যু তিনি বাঙালি হিন্দু নারীর শিক্ষাহীনতা, বালবৈধব্যের যন্ত্রণা নিরোধ, বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহের ফলে নারীর দুর্ভোগ বিষয় নিয়ে লেখালেখি, জনমত গঠন, আইন প্রণয়নে চাপ প্রয়োগসহ বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ-পরিচালনা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ, বিধবা নারীদের বিবাহ সংঘটন ইত্যকার নারীবান্ধব কাজে লিপ্ত ছিলেন। সমকালীন ভারতীয় সমাজের মনস্তত্ত্বটি খুব ভালো করে বুঝতেন বলেই বিদ্যাসাগর তাঁর নারীবাদী কর্মকাণ্ড শুধু যুক্তির বিচারে অগ্রসর করেননি, সঙ্গে তিনি ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ পাঠ ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দিকে নজর দিয়েছিলেন এবং তদানুসারে গ্রন্থও রচনা করেছেন। যদিও তিনি ঐশ্বরিক ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন না, তবু সনাতনী বাঙালির অন্তর্জগতে বিদ্যমান সংস্কারাচ্ছন্নতাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যেই তাঁর ধর্মশাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রের নামে প্রচলিত বিধানের খণ্ডণ করতে প্রয়াসী ছিলেন। এটি ছিল তাঁর সমাজের পুরুষতান্ত্রিক ধর্মীয় মানসিক জরা দূরীকরণের কৌশল। তিনি এর কৈফিয়তও দিয়েছেন,

> যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদানুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।[১৫]

এদেশীয় সামাজিক বিচারে নারীর অবস্থান এতই হীন ও নিম্নমানের ছিল যে, তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের হতাশা ব্যক্ত করেছেন এভাবে, ভারতবর্ষে যেন 'হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে'[১৬]। তাঁর মতে, নারীর বাল্যবিবাহ এবং পুরুষকুলীনের বহুবিবাহ- এ উভয়রীতির সামষ্টিক বিষফলই অসংখ্য হিন্দু বিধবা নারীর সৃষ্টি। তিনি 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে, *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"(২ খণ্ড), "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'*(২ খণ্ড) নামক গ্রন্থাদিতে তৎকালীন বাঙালি নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিক অবস্থার উন্নয়নে সুস্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং শিক্ষিত-সচেতন মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। উনিশশতকে বাল্যবিবাহকে 'গৌরী দান' প্রথার পুণ্য দিয়ে মেয়েশিশুর মানবিক বিকাশকে যেমন রহিত করা হত তেমনি বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশগতি রক্ষা করা, তাও ব্যাহত হত। এছাড়াও, বাল্যবিবাহের করুণতম পরিণতি বালবৈধব্য, যা নারীর জীবনে কঠোর-কঠিন ব্রত-উপবাসের মাধ্যমে নিয়ে আসে অপরিসীম যন্ত্রণা। 'বালবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, "যে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্বাহকরণ দুস্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব।" [১৭]

তিনি বিধবার আচরিত পারত্রিক-ব্রহ্মচর্যা অপেক্ষা জৈবিক-জীবন উপভোগকে অধিকতর মূল্যবান ও কর্তব্যকর্ম মনে করেছেন। কৌলিন্যের নামে যে সমাজে পুরুষের বহুভোগী জীবন বহুবিবাহ ধর্মস্বীকৃত, সে সমাজ বৈধব্যপ্রাপ্ত নারীর জন্য বিধান রেখেছে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহন নতুবা আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যার নামে নরক যন্ত্রণাসম অমানবিক কৃচ্ছতাসাধন। বিদ্যাসাগর বিধবা নারীর জৈবিক চাহিদাকে মানবিকবোধে বিচার করেছেন এবং ব্যক্তিক অবস্থান থেকে সহমর্মিতার সঙ্গে কর্মযোগে লিপ্ত হয়েছেন। সমাজে ভ্রূণহত্যা ও বিবাহবহির্ভূত ব্যভিচার রোধকল্পে বিধবাবিবাহকেই একমাত্র উপায় বিবেচনা করেছেন:

> কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্যনির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; অতএব পতিকুল ও পিতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তোরত্তর প্রবল হইতে থাকিবেক।[১৮]

তাই তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাধাকে তুচ্ছ পরিগণিত করে শাস্ত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত আর বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী। প্রকৃতবিচারে হিন্দু শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বিধবাবিবাহ চালুকরণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাঁর সারাজীবনের কর্মযজ্ঞের মূল প্রেক্ষণবিন্দু ছিল বাঙালি হিন্দু সমাজে আকঁড়ে থাকা কুসংস্কারগুলোর প্রতি। বিধবা বিবাহ চালুকরণ প্রসঙ্গে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা থেকে কলিযুগের ত্রাতা পরাশরের বিধান পর্যন্ত উদাহরণ হাজির করেছেন। বিধবা বিবাহের জন্য লেখালেখিই যথেষ্ট নয় তিনি জানতেন, তাই আইন পাশের জন্যও তৎপর হয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয় এবং এর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের সার্বিক প্রচেষ্টায় বাঙালি হিন্দু নারী জৈবিক চাহিদার এক আইনি স্বীকৃতি লাভ করে। যদিও তা সমাজে ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন হতে বহু সময় লেগেছে, এমনকি বিদ্যাসাগরকেই তার বাস্তবায়ন করতে হয়েছে নিজ পুত্রকে দিয়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানস বিধবাবিবাহ নারীর জন্য প্রযুক্ত ও বাস্তবায়ন করতে আজো লজ্জা বোধ করে। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালি নারীবাদী যখন নারীকে অগ্নিকুণ্ড থেকে, ধর্মীয়-সামাজিক বিধি-বিধানের জাল থেকে মুক্ত করতে লড়াই করছিলেন, তখন নারীর একান্ত ব্যক্তিক স্বাধীনতা, মানবীয় মর্যাদা বা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়গুলো সমাজ সম্মুখে হাজির করা ছিলো অনেকটাই অসম্ভব ও অলীক কল্পনা। যেখানে মানুষ হিসেবে নারীর মানবিক অধিকার লুণ্ঠিত এবং তা ছিল ধর্ম-সমাজ সমর্থিত; সেখানে নারীর ব্যক্তিক স্বাধীনতার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলি ছিল স্বপ্নাতীত অধরা। পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের অবস্থা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল, তা জোরের সঙ্গে বলা না গেলেও এটুকু বলা যায়, ভারতবর্ষীয় নারীর তুলনায় তারা বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিল। কারণ ইউরোপীয় রেঁনেসার ঢেউয়ে নারীর অধিকারের বিষয়গুলোও তখন সামনে হাজির হচ্ছিল, মেরীর উত্তরসূরীরা তখন ভোটাধিকারসহ অন্যান্য কিছু নাগরিক দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। নারীর ভোটাধিকার বিষয়ে হ্যারিয়ট টেইলর মিলের 'এনফ্র্যান্সাইজমেন্ট অব ওম্যান' (১৮৫১) প্রকাশিত হয়, যেখানে নারী পুরুষের অভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহযোগী ও স্বামী লেখক ও দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল নারীর অধীনতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন পুরুষতান্ত্রিকতার জাল কিভাবে নারীর অধীনতাকে প্রথায় পরিণত করেছে।

বলা হয়, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম পুরুষ যিনি নারীর অধিকার নিয়ে আধুনিক ইউরোপে সোচ্চার হয়েছিলেন। আধুনিক সময়ের বাংলার অন্যতম নারীবাদী তাত্ত্বিক ড.হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, "রুশো-রাসকিন পুরুষতন্ত্রের মহাপুরোহিত; নারীর জন্যে তাঁরা বিধিবদ্ধ করেছেন বিনোদযোগানো দাসীর ভূমিকা। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁদের বিপরীত; পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম নারীকে দেখেছেন মানুষরূপে এবং নারীর জন্যে খুলে দিতে চেয়েছেন মানবিক সমস্ত এলাকা।"[১৯] জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর The subjection of women (১৮৬৯) গ্রন্থে বলেছেন, পুরুষের

আধিপত্য ও নারীর বশ্যতার ব্যাপারটি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বলে যা প্রচার করা হয়, তা পুরুষতান্ত্রিক কৌশল এবং তা সমাজসৃষ্ট কৃত্রিম। তাঁর মতে, পুরুষের তুলনায় নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক হীন অবস্থাকে প্রাকৃতিক হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটিও পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ। তাঁর ভাষায়:

> So true is it that unnatural generally means only uncustomary, and that everything which is usual appears natural. The subjection of women to men being a universal custom, any departure from it quite naturally appears unnatural. But how entirely, even in this case, the feeling is dependent on custom, appears by ample experience.[২০]

নারীকে অধীন করার পক্ষে প্রচলিত সকল প্রকার প্রথার অন্তঃসার শূন্যতা, অযৌক্তিকতা এবং সেগুলো যে নারী-অবদমনের কৌশল তা তিনি অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে, পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নারীকে পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছে। এর জন্য প্রয়োজন নারী-পুরুষের অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা।

বৈশ্বিক নারীর অবস্থা বিচারে নারী বরাবরই ধর্ম, সমাজ, প্রথার কঠোর শাসনে আবদ্ধ, মানুষ হিসেবে একজন পুরুষকে সেসকল নিয়ম-নীতির কোনটাই পালন করতে হয় না। পরিবার থেকে রাষ্ট্র প্রতিটি পর্যায়ে নারী ও পুরুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ রকম পর্যায়ে দেখা যায়, ১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৬জন নারী মিলে নারীর দৃষ্টিকোণে ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে The Woman's Bible নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে বাইবেলের ব্যাখ্যার নতুন রূপায়ণ ঘটেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন বলেছেন:

> The Bible teaches that woman brought sin and death into the world, that she precipitated the fall of the race, that she was arraigned before the judgement seat of Heaven, tried, condemned and sentenced. Marriage for her was to be condition of bondage, maternity of period of suffering and anguish, and in silence and subjection, she was to play the role of a dependent on man's bounty for all her material wants, and for all the information she might desire on the vital questions of the hour, she was commanded to ask her hasband at home. Here is the Bible position of woman briefly summed up.[21]

গ্রন্থের লেখকগণ মনে করেন যে, যুগ যুগ ধরে পুরোহিত হোক বা খ্রিস্টীয় যাজক হোক পুরুষগণ বাইবেলের ব্যাখ্যায় নারীকে পুরুষের দাস হিসেবে দেখানোর চেষ্টায় রত থাকে। তারই প্রতিবাদে এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টনের নেতৃত্বে 'নারীর বাইবেল' লিখিত হয়, যা ঐ সময় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিলো, বাইবেল যদি নারীর সাম্যের শিক্ষা দেয়, তবে গির্জা কেন মহিলাদের সুসমাচার প্রচার করতে, ডিকন এবং প্রবীণদের অফিসগুলি পূরণ করতে এবং স্যাক্রেমেন্টস পরিচালনা করতে বা তাদেরকে সিনডস্ বা জেনারেল এসেম্বলির প্রতিনিধি হিসেবে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করাতে অস্বীকার করে? তারা কখনো কোনও মহিলাকে তাদের বাইবেল সংশোধন কমিটির কোনটিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি, এমনকি স্বর্গে তারা যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তার একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে বা তার দ্বারা প্রদত্ত বাক্যটি হ্রাস করার চেষ্টাও করেনি। .সমকালীন বাস্তবতায় এলিজাবেথকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ পরিবেশে লড়াই করতে হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের National Woman Suffrage Associatin (NAWSA) নেতৃত্বের আসন থেকেও তাঁকে বাদ দেয়া হয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলো যে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হলে সে সময়ে চলমান নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনটির লক্ষ্য পূরণ হবে না। উল্লেখ্য, এলিজাবেথ স্ট্যান্টন নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন ১৮৪৮ সালে অনুষ্ঠিত সেনেকা ফলস্ কনভেনসনের জন্য 'সেন্টিমেন্টস অফ ডিক্লারেশান' লিখেছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন সংগঠিতকরণ ও নেতৃত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

ইউরোপ জুড়ে নারীরা যখন ধর্মশাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির বা নাগরিক অধিকারের অন্যতম শর্ত ভোটাধিকারের দাবিতে সরব, তখন বাংলার নিভৃত কোণে নারীর হীনাবস্থা সন্দর্শনে একজন স্বশিক্ষিত সচেতন নারী মুসলিম নারীদের ইতরাবস্থা পরিবর্তনে লেখালেখিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন, তিনি হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বাংলার দুই মহারথী, রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীবান্ধব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজের নারীর মানবাধিকার-সংগ্রামের যে মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন, রোকেয়া সেই মশালটিকে আরো প্রজ্জ্বলিত বেগে এগিয়ে নিয়েছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীর সূত্রে সমগ্র নারীসমাজের স্বাধিকারের প্রশ্নে। তিনি পুরুষতান্ত্রিকতার নাগপাশ থেকে মুক্তির কথাই শুধু বলেননি, এ লক্ষ্যে নারীসমাজের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাও তুলে ধরেছেন। সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিকতা নিয়ে তিনি যেমন প্রতিবাদমুখর ছিলেন তেমনি নারীদের আলস্য, অলঙ্কারপ্রিয়তা, স্থূলতা, পরনির্ভরতা, এমনকি নারীসুলভ অহেতুক ভীরুতা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নারীর মানসিক উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্ব গঠনে খুঁটিনাটি সকল দিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন। কীট-পতঙ্গে অহেতুক ভীরুতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য -

> "ব্যঘ্র ভল্লুক তো দূরে থাকুক, আরশোলা জলৌকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই। এমনকি অনেকে মুর্চ্ছিতা হন! একটি ৯/১০ বছরের বালক বোতলে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চীৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোতল হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাশা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি – আর সে কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি।"[২৩]

নারীর এ প্রকারের ভীরুতা ব্যক্তিত্বহীনতারই নামান্তর, যা রোকেয়াকে পীড়িত করেছে। তেমনি নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তাকেও তিনি নিন্দা করেছেন; অলঙ্কার পরিধানকে "দাসত্বের নিদর্শন" (badges of slavery) এবং সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাকে মানসিক দুর্বলতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। রোকেয়া মানবিক অধিকারের প্রশ্নে নারীর সচেতনতা ও জাগরণের প্রয়োজনীয়তাকে যৌক্তিক মানদণ্ডে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, বিরুদ্ধ-প্রতিকুল সমাজ-পরিবেশে নারীর অগ্রযাত্রা দৃঢ় মানসিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই নারী সমাজের প্রতি তাঁর উজ্জীবনী বার্তার ধরণ;

> "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি (ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে ("but nevertheless it (Earth) does move")!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে"[২৪]।

এখানে রোকেয়া নারীর প্রতি সহানুভূতি নয়, স্ব অবস্থান পরিবর্তনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। তিনি জানতেন সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন বড়ই কষ্টসাধ্য। তিনি এক পত্রে রূপকচ্ছলে লেখেন,'উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়।'[২৫]

নারীবাদের নানা ঘরানা রয়েছে, রোকেয়া ছিলেন আমূল নারীবাদী ধারার (radical feminist), যদিও তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেকসময় তাঁকে আপসও করতে হয়েছে, সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর চিন্তনের যোজন যোজন ফারাকের কারণে। এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টনরা যেখানে নারীর বাইবেল রচনার তাগিদ অনুভব করেন, তেমনি ঐসময় রোকেয়ার চিন্তনে হানা দেয় ধর্মশাস্ত্রের পুরুষতান্ত্রিকতার ব্যাপারটি। তরুণী রোকেয়ার যাপিত জীবনের দর্পনে সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মের যে রূপটি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, তার অকপট প্রকাশ ঘটেছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ তথা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে রচিত তাঁর প্রবন্ধে, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, "এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুণিদের

বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুণির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।...যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।"[২৬] প্রবন্ধটিতে রোকেয়ার সামগ্রিক মানস ধরা পড়েছে, যদিও সমকালীন বিরুদ্ধ পরিবেশের চাপে কিছু বক্তব্য পরবর্তীতে সরিয়ে নিতে হয়েছিলো। তৎকালে এ প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে প্রতিবাদ হলে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বিশেষ বিশেষ পাঁচটি স্তবক বাদ দিয়ে নতুন সাতটি স্তবক যুক্ত করে শিরোনাম কিঞ্চিৎ বদল করে 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামে প্রবন্ধটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'মতিচূর' ১ম খণ্ডে স্থান পায়। একই সময় অর্থাৎ তাঁর ২৫ বৎসর বয়সে লেখা ইংরেজীতে *Sultana's Dream*[২৭]

নামক ইউটোপিয়াতে সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা বদলে দিয়েছেন, পুরুষরা অন্তঃপুরে বন্দী আর নারীরা বাইরের কর্মযজ্ঞে লিপ্ত। নারীর অন্তঃপুরের 'জেনানা' প্রথার বদলে সেখানে দেখা যায় পুরুষের অন্তঃপুর অর্থাৎ 'মর্দানা' প্রথার। কল্পনার সেই রাজ্যে বাস্তবিক সমাজে প্রচলিত নারীর ভূমিকা ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষের মধ্যে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। সেখানে পুরুষেরা প্রকৃতিগতভাবে অপরাধপ্রবণ বলে চিহ্নিত, তাই গৃহাভ্যন্তরে তাদের অবস্থান বাধ্যতামূলক। অন্দরে পুরুষেরা সন্তানাদি লালন-পালন করে থাকে, সঙ্কোচ ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে বহিরাঙ্গনে পথ চলে। আর নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনাসহ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির সমাধানে থাকে তৎপর। সেখানকার উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নারীরাই শিক্ষক, গবেষক ও পরিচালক এবং সেখানে তারা বিজ্ঞানচর্চা ও নানা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকেন। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে মানুষের চিন্তার ধরনকে, দেখার ভঙ্গিকে উল্টে-পাল্টে দেয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন রোকেয়া, যদিও তা কল্পকাহিনীর মোড়কে। যে পেশীশক্তির অহঙ্কারে পুরুষ নারীর উপর প্রভুত্বের ছড়ি ঘোরানোর যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে, সে যুক্তি সত্য-বিচারে যে ধোপে টেকে না। তা তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যে দেখা যায়,

> "কেবল শারীরিক বল বেশী হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে?"[২৮]

কারণ, পেশীশক্তির দাপট দেখাতে পারে পশু আর বিদ্যা-বুদ্ধি, বিবেক-মানবিকতার বিষয়ে গর্ব করবে মানুষ। রোকেয়ার কল্পরাজ্যের নারীস্থানের নারীরা জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, মানবিকতায় নর-নারী উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। এখানে নারীরা সুশিক্ষিতা ও স্বাধীন, পুরুষরা থাকে আবদ্ধ। তাই নারীস্থানে কোন অপরাধ নেই, কারণ স্বয়ং অপরাধপ্রবণ গৃহরূপ কারাগারে বন্দী। বাঙালি অবরোধবাসিনী সুলতানার বহিরাঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে নারীস্থানের সারার বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,"হ্যাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,– যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে। তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না।"[২৯]

তৎকালীন শুধু নয় বর্তমান সময়, সমাজ ও ধর্মীয় বাস্তবতায় রোকেয়ার রচনাটি বৈপ্লবিক। সময়ের বিরুদ্ধ স্রোতে কিভাবে বজ্রকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে হয় তা রোকেয়া দেখিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ নিয়েও তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁর ধর্ম-দর্শনের মূলনীতি হলো প্রেম ও সত্য; পারস্পরিক ভালোবাসাই হওয়া উচিত ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।[৩০] তিনি অপরাধীর শাস্তি প্রাণদণ্ডেরও বিপক্ষে, ক্ষমার মধ্য দিয়ে বিচারকের মহত্ব প্রমাণিত হয়, যদি অপরাধী অনুতপ্ত হয়। এতে সমাজ-রাষ্ট্রের মঙ্গল, মানবতার জয় ধ্বনিত হয়। এ বিষয়ে তাঁর কল্পোপন্যাসের নারীস্থানের সারার বক্তব্যে রোকেয়ার মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে.

> "না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায় – বিশেষতঃ মানবহত্যায় আমোদ বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয় এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না"।[৩১]

প্রচলিত বিধি-বিধান তা সামাজিক প্রথা হোক বা ধর্মীয় আইনই হোক, নারীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছে। তাই তিনি নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম নিয়ামক মনে করেন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকে, যা তিনি আরেক ইউটোপিয়া 'পদ্মরাগে' স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সকল সমাজ ও জাতির নারীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুখাপেক্ষিতা, বিবাহ, পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন ও ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যায় যে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মনগড়া প্রতিবন্ধকতা নির্মাণ করে চলে, যা 'পদ্মরাগে'র তারিনীভবন আশ্রমে আশ্রিতা নারীদের অভিজ্ঞতায় চিত্রিত। আমরা এখানে সত্তরের দশকে নারীবাদী ক্যারল হ্যানিশের 'ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্রই রাজনৈতিক' (The personal is political) শ্লোগানের ধ্বনিই যেন শুনতে পাই। গবেষক সোনিয়া নিশাত আমিনের মতে, পদ্মরাগের তারিণী ভবন হলো ফেমিনিস্ট ইউটোপিয়া, যেখানে রোকেয়া তাঁর নারীবাদী ও সাম্যবাদী আদর্শকে পরতে পরতে প্রতিবিম্বিত করেছেন।[৩২] যথাযথ সুযোগ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূত্রে নারীর ক্ষমতায়ন লাভ সম্ভব। ক্ষমতায়িত নারীই রোকেয়ার স্বপ্ন-কন্যা। স্বাবলম্বনের পথ খুঁজে পেয়ে আত্মপ্রত্যয়ী সিদ্দিকার বয়ানে তাই দৃঢ়তার ছাপ, 'একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসার ধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।'[৩৩] তিনি 'পদ্মরাগে'র সিদ্দিকা চরিত্রের মধ্যদিয়ে ভবিষ্যতের নতুন প্রজন্মের নারীর বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপ চিত্রিত করেছেন, যে পুরুষের অবহেলাকে অপমান মনে করে, নারীর নিয়তি বা ভাগ্য মনে করে না এবং সে মনে করে যে সংসার, কন্যা, জায়া ও জননীর বাইরেও তার আলাদা স্বকীয় স্বাধীন সত্তা বিদ্যমান। রোকেয়া তাই সিদ্দিকার স্বরে তুলে ধরেছেন,

> 'সংসারধর্ম' আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সেই অবমাননা কি করিয়া ভুলিব? তাহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন,- আমাকে চাহেন নাই! আমরা কি মাটীর পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে,... তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সেদিন আর নাই।"[৩৪]

ভাষার ক্ষেত্রে পুরুষ আধিপত্য স্বীকারমূলক শব্দ ব্যবহারের দিকেও তিনি নজর দেন। স্বামী শব্দটির অর্থ প্রভু। নর ও নারী সামাজিক চুক্তি তথা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে, সেখানে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসাই প্রধান উপজীব্য। কিন্তু বাঙালি সমাজে একজন নর নারীর উপর প্রভুত্ব দাবি করে তা 'স্বামী' শব্দেরই জোরে, যার অর্থ প্রভু। এ প্রসঙ্গে রোকেয়ার যুক্তি,

> "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়।... একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্য-প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চায়। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতিগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?"[৩৫]

শুধু মানুষের চিন্তন ও কর্মে নয়, ভাষায়ও লৈঙ্গিক রাজনীতি কিভাবে লুকায়িত থাকে তা তিনি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই তিনি কর্তৃত্ববাদীর প্রতিশব্দ 'স্বামী' শব্দের পরিবর্তে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দ প্রচলনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৩৬]

রোকেয়া লিঙ্গনিরপেক্ষ সাম্যবাদী সমাজে বিশ্বাসী ছিলেন। সমকালের চেয়ে অগ্রচিন্তার অধিকারী রোকেয়া এও বিশ্বাস করতেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই বৃহৎ মানবসমাজেরই অংশ এবং নারী-পুরুষের ভূমিকার ভিন্নতা

জৈবিক নয়, ঐতিহাসিক; নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ প্রাকৃতিক নয়, সামাজিক; যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত। তাই তিনি নারী পুরুষের সমকক্ষতার ভিত্তিতে সমাজ-বিনির্মাণের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে গেছেন। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও অসাম্য দূরীকরণে তাঁর লেখালেখি ছিল নির্দেশনামূলক। সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের পথ নির্দেশনা সমানতালে তিনি দিয়েছেন। নারীবাদ তথা নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন তাত্ত্বিক হিসেবে, সমাজ সংস্কারক হিসেবে এবং শক্তিশালী মননশীল লেখক হিসেবে তাঁর অবস্থান বৈশ্বিক বিচারে অনন্য উচ্চতায় আসীন।

তথ্যনির্দেশঃ

১ সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, *জেন্ডারকোষ* (ঢাকা, ২০০৬), পৃ. ৭৬০।

২ উদ্ধৃত, মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারীজীবন* (ঢাকা: জে,কে, প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস, ২০০২), পৃ. ৫৩।

৩ রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোকেয়া হল,২০১৬) পৃ.২৮৩।

৪ Olive Banks, *Faces of Feminism: A study of feminism as a social movement* (New York, St. Martin press,1981), p.3.

৫ আব্দুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ.১১।

৬ পূর্বোক্ত, পৃ.১৯-২০।

৭ পূর্বোক্ত, পৃ.১৮।

৮ পূর্বোক্ত, পৃ.১৮।

৯ পূর্বোক্ত, নিবেদন।

১০ Marry Wollstonecraft *A Vindication of the rights of Woman with the structures on political and moral subjecs,* Edited & Published by PDF Books World, p.7. (http://www.pdfbooksworld.com.)

১১ Ibid, p.21.

১২ উদ্ধৃত, অসিতবরণ ঘোষ, রামহেন (ঢাকা: ধ্রুবপদ, ২০১৮), পৃ.১২০।

১৩ হুমায়ুন আজাদ, নারী (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১১), পৃ.২৭১।

১৪ ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৫) পৃ.৮১।

১৫ হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত। পৃ.২৭৪।

১৬ দেবকুমার বসু সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭০), পৃ.২৬৪।

১৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৪৭।

১৮ উদ্ধৃত, হুমায়ুন আজাদ, নারী, পৃ.২৭৩।

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯।

২০ John Stuart Mill, *The subjection of women*, 1869, p.23. eBook www.gutenberg.org.

২১ Elizabeth Cady Stanton, *The Woman's Bible,* eBook at www.gutenberg.org

২২ ibid.

২৩ আব্দুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া *রচনাবলী*, পৃ.১৬।

২৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৯-২০।

২৫ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৮৭।

২৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৭৪।

২৭ গ্রন্থটি ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে Sultana's Dream নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে মতিচুর ২য় খণ্ডে 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে।

২৮ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১০৩।

২৯ *পূর্বোক্ত*।

৩০ *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৩।

৩১ *পূর্বোক্ত*।

৩২ আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া (সম্পাদন), রোকেয়া যুক্তিবাদ নবজাগরণ ও শিক্ষা সমাজতত্ত্ব (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ.২১৮-২১৯।

৩৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫৬।

৩৪ *পূর্বোক্ত*।

৩৫ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩০।

৩৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

নারী প্রসঙ্গে রোকেয়ার প্রত্যাশা

সন্ধ্যা মল্লিক*

অখণ্ড ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কালভেদে সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন আর্য-পূর্ব যুগে নারীর শিক্ষা লাভের সুযোগ কিছুটা প্রশস্ত ছিল এবং অনুষঙ্গ হিসেবে নারীর স্বাধীনতা ক্ষেত্র বিশেষে অল্প-বিস্তর ছিল বলে জানা যায়। আর্যদের আগমনের পর ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীর যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে নারীকে ঠিক মানুষ পর্যায়ের জীব বলে মনে হয় না। মানবেতর এই জীবটি সংসারে একই সাথে নানা ভূমিকা পালন করে। জননী-জায়া-ভগ্নী এই তিনরূপের সাথে তার আরও পরিচয়–সে পরিচারিকা, রাঁধুনি ও শয্যাসঙ্গী। দাসী থেকে তথাকথিত কর্তামা সব চরিত্রেই নারী সাবলীল। কেবল তার নিজের রূপটিই তার জানা ছিল না। পুরুষ শাসিত সমাজে নিজ অস্তিত্বের বিশুদ্ধ অনুভব নারী কোন কালে পায়নি। ধর্মের নামে শাশ্বত নারীর আদর্শে নিজেকে গড়তে গিয়ে তার স্বকীয়তার বিসর্জন ঘটতে শুরু করে ৬/৭ বছর বয়স থেকেই। আর পূর্ণ নারীতে পরিণত হওয়ার আগেই সংসারের ঘানিতে জুড়ে মাতৃত্বের অসীম গৌরবে তাকে গৌরবান্বিত করা হয়। সংসারে আর পাঁচজনের আমোদ দেখে এবং মিথ্যা স্তোক বাক্যে কেবল শৈশব পেরুনো সদ্য জননী পদে অভিষিক্ত নারীও ধীরে ধীরে নিজের পরিসর ছোট করতে শুরু করে। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ক্রমে অধস্তন ও দাসীতে পরিণত হয়।

নারী-পরিস্থিতির এই অবস্থায় রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলায়। রোকেয়ার নিজের জবানিতে জানা যায় তাঁর পরিবারে পর্দা প্রথার দৌরাত্ম্যের কথা। এ প্রসঙ্গে মাহমুদ শামসুল হক বলেন, "বাঙলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয় ১২০৪ সালে। তখন থেকে নবদীক্ষিত মুসলিম পরিবারের নারীদের ওপর আরেক দফা পর্দার কড়াকড়ি আরোপিত হয় ভিন্ন আঙ্গিকে। এ সময় মুসলমান নারীরা গৃহাভ্যন্তরে প্রায় অন্তরীণ হয়ে পড়েন।"[১] পর্দার বাড়াবাড়ি কেবল মুসলিম পরিবারেই ছিল– তা নয়। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রেও পর্দার কড়াকড়ি কম ছিল না। উঠোন কিংবা ছাদ কোথাও যাওয়া নারীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল; নিষিদ্ধ ছিল দিনের বেলা স্বামীর সাথে কথা বলা। এমনকি ননদ ও অন্যান্য আত্মীয়াগণ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাদের সামনে বড় ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো মেয়েদের। পুণ্যার্থী বনেদী হিন্দু নারীকে পর্দার কারণে পালকিসহ গঙ্গায় চুবিয়ে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থার কথা জানা যায়। হিন্দু সমাজে পর্দা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য সে সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

> বাড়ির বাইরে যাওয়া দূরের কথা, বাড়ীর ছাদে ওঠাও মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে এই নিয়ম ছিল। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বিজয়া দশমীর দিন দেবী দর্শন করতে মেয়েরা ছাদে ওঠার অনুমতি পেত। কিন্তু ওই একদিনের ছাদে ওঠা নিয়েও কথা উঠত।[২]

সমাজে শিক্ষার অভাব আর ধর্মের নামে সকল রকম শোষণ তখন চরমে পৌঁছেছে। এ অবস্থার মধ্যেও রোকেয়া বড় বোন করিমুন্নেসা ও বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের প্রযত্নে গোপনে খানিকটা লেখাপড়া শিখেন। বিবাহের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহে তাঁর বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য রচনা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলে। কিন্তু স্বামীর অকাল প্রয়াণে এবং সপত্নী কন্যা ও জামাতার উৎপীড়নে স্বামী গৃহ ছেড়ে তিনি চিরতরে কলকাতাবাসী হন। ইতোপূর্বেই তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাগলপুরে স্কুল নির্মাণের প্রথম প্রয়াস ধূলিসাৎ হয়েছে। কলকাতায় আসার প্রায় দেড়বছর পর ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ আবার বিদ্যালয় স্থাপন করেন রোকেয়া। বহু বাধা অতিক্রম করে বেশ কয়েকবার স্থানান্তরের পর ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়টি নিজস্ব ভবনে

* আবাসিক শিক্ষক, রোকেয়া হল ও সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও তার বহু পূর্বে ১৯৩২ সালে রোকেয়া লোকান্তরিত হয়েছেন। রোকেয়ার মহাপ্রয়াণের প্রায় শতবছর পরে নারী প্রসঙ্গে রোকেয়ার প্রত্যাশা কতখানি পূরণ হয়েছে তা বলা গবেষণা সাপেক্ষ। কেননা বর্তমানে নারী শিক্ষায় ও কর্মে অনেকখানি এগিয়ে এলেও সমাজে নারীকে অধস্তন মনে করার মধ্যযুগীয় মানসিকতা এখনও বর্তমান।

পাশ্চাত্যে অষ্টাদশ শতকে নারীবাদের উন্মেষ ঘটে। প্রাচ্যে তার বিকাশ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে মুসলিম সমাজে এর বিলম্বিত প্রকাশ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। রোকেয়া তাঁর সমকালের সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মনে করেন শিক্ষার মাধ্যমে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে অধস্তন করে রেখেছে নানা কৌশলে। নারীর কর্মভার লাঘব করে তাকে অকর্মণ্য করে প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষতি করেছে পুরুষ। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন:

> ...তাঁহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া-ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলতঃ তাহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি।[৩]

দিনে দিনে নারীর কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করে তাকে গৃহকোণে আবদ্ধ করেছে পুরুষ। আর নিষ্ক্রিয় হতে হতে অকর্মণ্য পুতুলে পরিণত হয়ে নারী স্বাধীনতা হারিয়েছে। পরাশ্রয়ী জীবনে তার স্থান নির্ধারিত হয়েছে পুরুষের নীচে। Mary Wollstonecraft অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে নারীর এই অবস্থাকে স্বামীর রক্ষিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ছাঁচে ছেলে সন্তান জন্মের পর থেকে পুরুষ ও কর্তা হয়ে ওঠে। অন্য দিকে মেয়ে সন্তান পরিণত হয় শাশ্বত নারী ও দাসীতে। বহু যুগ ধরে অবদমিত নারী শক্তিহীন অক্ষমে পরিণত হয়েছে। পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছাটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। রোকেয়া নারীর এই অবস্থা বর্ণনা করেন এভাবে: "ইহার কারণ এই যে বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না"[৪]। রোকেয়া এরই প্রেক্ষিতে নারীর নিকট প্রত্যাশা করেছেন, মেয়েদের জেগে উঠতেই হবে সমাজের প্রয়োজনে। বাধা আসবে, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, এমনকি নারীকে এর জন্য শাস্তিও পেতে হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবুও নারী যেন তার অগ্রগমন থামিয়ে না দেয়। কেননা রোকেয়া মনে করেন, ভালো কিছু করা যেমন ক্লেশ সাপেক্ষ, তেমনি সমকালে এ ধরনের কর্মপ্রয়াস অধিকাংশে নিন্দিতই হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> ১৮০০ শতকে যখন নারীবাদী পথিকৃৎ মহিলারা নারী শিক্ষা নারী অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, নারী পুরুষ সমতা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তখন পত্র পত্রিকায় তাদের ব্যঙ্গ করা হত, তাদের নিয়ে কার্টুন ছাপা হত, ...এমন কি নারীদের মধ্যেও তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল। ... Queen Victoria একজন প্রখ্যাত ও ব্যতিক্রমী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নারীবাদীদের সুনজরে দেখেননি। তিনি নারীবাদী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[৫]

রোকেয়া পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের ন্যায় অনেক ক্ষেত্রেই আপসহীন হতে পারেননি। কেননা প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্যের অনুরূপ নয়। এছাড়া উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মুসলিম সমাজ আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে ওঠায় রোকেয়াকে অনেক বেশি সাবধানী হতে হয়েছে। কাঠমোল্লাদের অভিশাপ ছিল তার নিত্য দিনের প্রাপ্তি। তিনি সমাজের অনেক ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাস নীরবে সহ্য করে লক্ষ্য সাধনে অটুট থেকেছেন।

রোকেয়ার প্রত্যেক রচনাতে নারীর প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। নারী একদিন দেশের কল্যাণে কাজ করবে–এই আশা তিনি অন্তরে লালন করতেন। 'সুলতানার স্বপ্ন'–এর সূচনাতে তিনি বলেন, "...ভারত ললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম–আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?..."[৬] প্রকৃতপক্ষে নারীকে কল্পনায় তিনি যে রূপে অঙ্কিত করেছেন, বাস্তবে সেইরূপ দেখতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন নারী লজ্জা–জড়তা ঝেড়ে ফেলে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাক কর্মক্ষেত্রে। রোকেয়া মনে করেন নারী প্রকৃতিগতভাবে সৎ, ধৈর্যশীল, নিরলস কর্মী। তাই তারা কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে সকল কাজ সততা, ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে। পুরুষের ধৈর্য্যহীনতা ও বাগাড়ম্বর নারীকে স্পর্শ করবে না। যথার্থ দেশপ্রেমিকের ন্যায় দেশ ও জাতির কল্যাণে নারী তার মনন, মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগাবে বলে রোকেয়া মনে করতেন। জীবিকা অর্জনে স্বাধীন হয়ে নারী নিজেই নিজেকে পরিচালনা করবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর মূলে যে অশিক্ষা তা দূর করে নারী নিজ স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হবে। রোকেয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, নারী মেধা ও মননে পুরুষের সমতুল্য, সমান সুযোগ ও শিক্ষা নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করবে। তাই যে সকল সমাজ সংস্কারক মনে করেন মেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন হওয়া উচিত– রোকেয়া তাদের সাথে একমত নন। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সমাজ সংস্কারকদের মনোভাব তুলে ধরা হলো: "...মেয়েদের জন্য ভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক লেখা উচিত। ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তকদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, মেয়েদের গৃহ রক্ষা, রান্না, সেলাই ও শিশু পালনের বিষয়েই শেখানো উচিত।"[৭] রোকেয়া নারীকে সকল বিদ্যা অধ্যয়নের যোগ্য বলে মনে করতেন। গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা সবই নারীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হোক রোকেয়া এই আশা পোষণ করতেন। রোকেয়া নারীকে অলঙ্কার রাখার স্তম্ভরূপে দেখতে চাননি। পুরুষ অলঙ্কারের বিনিময়ে নারীর মানবিক অধিকার হরণ করলে, সে অলঙ্কারে নিজেকে না সাজিয়ে গৃহ সজ্জার কাজে ব্যবহারের জন্য নারীকে পরামর্শ দেন রোকেয়া। তাঁর মতে, অলঙ্কাররূপী ভূষণ একান্তই আরোপিত। কিন্তু শিক্ষা এমন ভূষণ যা দ্বারা ভূষিত হলে নারীর স্বকীয়তার বিকাশ ঘটবে। তাই রোকেয়া নারীকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। সমাজের উদারচেতা পুরুষের কাছে আবেদন করেন, কন্যাকে অলঙ্কারে সজ্জিত না করে জ্ঞানের দ্বারা অলঙ্কৃত করতে। তাঁর প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

> এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই–তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান–ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান–ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৮]

রোকেয়া আশা করেন গহনার জন্য অপব্যয় না করে ঐ টাকায় "জেনানা স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হোক। যে স্কুলে স্বচ্ছন্দে বিদ্যা শিক্ষা করবে মেয়েরা। রোকেয়া মনে করেন, এর ফলে মেয়েরা আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ ও ভোগের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

নারীর লিঙ্গ নিরপেক্ষ ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণ রোকেয়ার কাঙ্ক্ষিত ছিল। পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠা বলতে তিনি নারী সুলভ জাড্য কাটিয়ে নারীর আত্মোন্নতি ঘটানোকেই বুঝিয়েছেন। রোকেয়া এ সত্য উপলব্ধি করেন যে, এরকম উন্নতির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্লেটো বলেছিলেন, গৃহকর্মের ভার থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে ও সমান শিক্ষা প্রদান করলে নারীও শাসকের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। রোকেয়াও মনে করেন, বিবাহই নারীর একমাত্র লক্ষ্য নয়, সন্তান পালন ও গৃহকর্মাদি সম্পাদন একমাত্র কাজ নয়। মননশীলতার চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি ও আবিষ্কার এবং জীবিকা অর্জনে স্বাবলম্বী হওয়া নারীর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। তবে তিনি নারীর ঐতিহ্যিক আদর্শকে অস্বীকার করেননি। ফলে ঐতিহ্যগত আদর্শ এবং নারীর লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভূমিকা এ দু'য়ের সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর সাহিত্যপাঠে এ প্রত্যয় জন্মে যে তিনি দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় করেছিলেন।

রোকেয়া প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্যের উন্নয়ন–দুটোকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদের বক্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোলাম মুরশিদ বলেন, "যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ঐতিহ্যিক ভূমিকার সঙ্গে আপোশ–এমন কোনো সংশ্লেষণ তিনি করতে পেরেছিলেন কিনা, তারও কোনো স্পষ্ট ছবি তাঁর রচনায় পরিস্ফুট নয়।"[৯] উল্লিখিত দুই আদর্শের মধ্যে সমন্বয় হোক রোকেয়া এটাই আশা করেছিলেন। সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত তিনি প্রকাশ না করলেও এ বিষয়ের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাতে তাঁর কল্পিত 'নারীস্থানে' এইরূপ সমন্বয়ের সাক্ষ্য আছে। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, সে দেশের নারীরা অফিসে কাজ করেন, স্বল্প সময়ে তৎপরতার সাথে সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্নও করেন। আবার গৃহে ফিরে সূক্ষ্ম সূচিকর্ম, উদ্যান পরিচর্যার মতো কাজগুলোও যত্নের সাথে করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের অফিসগামী গৃহকর্মবিমুখ পুরুষের ভূমিকায় তিনি নারীকে দেখতে চাননি। রোকেয়া জেন্ডার সমতা নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নারী সংসারের কর্মভার একক দায়িত্বে বহন করবে না। নারীর পাশাপাশি পুরুষকেও সে ভার কাঁধে তুলে নিতে হবে। তিনি ঐতিহ্যগত আদর্শের যেটুকু নারীর আত্ম বিকাশের অন্তরায় নয়, সেটুকু বর্জন করতে বলেননি। তবে নারীর স্বীয় সত্তার বিকাশই ছিল রোকেয়ার মুখ্য লক্ষ্য। বোরকা প্রবন্ধে এই বিষয়ে রোকেয়ার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এভাবে: "আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে।"[১০]

রোকেয়া তত্ত্ব কথায় তুষ্ট নির্জীব জ্ঞানী নন। তিনি সক্রিয় কর্মী। তিনি মনে করতেন নারীর অধিকার আদায়ে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর কর্মপ্রয়াস শুরু হয় স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার আদায়ে যে সকল নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। রোকেয়া নারীদের পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে নারী কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদের তদ্রূপ করা উচিত।"[১১] রোকেয়া মুসলিম নারীদের সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার আদায় ও সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে–খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন বস্তিতে সেলাই, শিশুপালন, স্বাস্থ্যবিধি, ধর্মীয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে মেয়েদের সচেতন ও স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চালায়। এ সংগঠন স্বদেশী আন্দোলনের কালে মেয়েদের মধ্যে স্বদেশী চেতনা বিস্তারেও কাজ করে। চরকা কেটে সুতা তৈরি থেকে বিলেতি দ্রব্য বয়কটের মতো কর্মসূচিতেও রোকেয়ার নেতৃত্বে এই সমিতির সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। 'আঞ্জুমানে–খাওয়াতিনে ইসলাম' মুসলিম নারীর সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত অধিকার বিষয় নিয়ে কাজ করে। রোকেয়া নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য সংঘটিত কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে রোকেয়া বিভিন্ন সভা সমিতির সাথে যুক্ত থেকেছেন। খান বাহাদুর তসাদ্দক আহমদকে লেখা পত্রে এর প্রমাণ মেলে। পত্রের অংশ বিশেষ এই রূপ: "আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। স্কুলের পুরো কাজ ছাড়া অন্যান্য সমিতির কিছু কাজও আমাকে করতে হয়।"[১২] আমৃত্যু বিরামহীন কাজের মাধ্যমে তিনি নারী সমাজকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আর নারীর জন্য রেখে গেছেন এক মহিমাময় আদর্শ। রোকেয়ার কাল বিগত হয়েছে প্রায় শত বছর হলো। কিন্তু নারী সমাজে এখনও রয়ে গেছে নানা ধরনের সমস্যা, অধিকারহীনতা, বৈষম্য। রোকেয়ার আদর্শ যারা লালন করেন সেই শিক্ষিত নারী-সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে এই অন্যায্যতার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে নিশ্চয়। বোধ করি এ প্রত্যাশাও দূরদর্শী রোকেয়ার অন্তরেও সুপ্ত ছিল।

তথ্যনির্দেশ:

১ মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০০), পৃ.১০৬।
২ মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), পৃ.৪৮।
৩ স্ত্রী জাতির অবনতি, আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা) *বেগম রোকেয়া রচনাবলি* (ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ২০১৮), পৃ.৩৫।
৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।
৫ মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা: জে. কে. এম এণ্ড পাবিলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬), পৃ.৫৪।
৬ সুলতানার স্বপ্ন, *বেগম রোকেয়া রচনাবলি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২২।
৭ মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬।
৮ বোরকা, *বেগম রোকেয়া রচনাবলি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৬-৬৭।
৯ গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* (ঢাকা: অবসর প্রকাশন সংস্থা, ২য় মুদ্রণ, ২০১৮), পৃ.১৯৭।
১০ বোরকা, *বেগম রোকেয়া রচনাবলি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।
১১ প্রাগুক্ত।
১২ পত্র-২১, *বেগম রোকেয়া রচনাবলি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৭।

রোকেয়ার নারী ভাবনা: পদ্মরাগ

হোসনে আরা খানম

বাঙালি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ছিলেন এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বলে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত বাঙালি মুসলিম নারীসমাজকে তিনি দিয়েছিলেন আলোর সন্ধান, দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের সাথে নারীর সমাধিকার দাবি উত্থাপন করেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে শক্তিশালী মতবাদ প্রচার করেন। নারীমুক্তি অর্জনের জন্য নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখার প্রথার মূলোচ্ছেদ এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আমরণ তিনি আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্মজীবন বিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁসের জ্ঞানের আলোক, মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও উদারতা তাঁর চিন্তা চেতনা ও কর্মজীবনকে উদ্ভাসিত করেছিল। উদ্যম, ত্যাগ, কঠোর কর্মনিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তাশীলতাও সৃজনশীলতার বলে তিনি তাঁর জীবন ও সময়কালের পারিপার্শ্বিকতার অনেক উর্ধ্বে উঠে এবং সমগ্র বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করতে সমর্থ হন।

সমাজ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্তে নারীর সচেতন ও শিক্ষিত হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়া যে আবশ্যক, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির যে অপরিহার্যতা রয়েছে এবং নারীর মানসিক দাসত্বের অবসান যে একান্তভাবে কাম্য তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। চেতনার দীপ্ত চারিত্র্য এবং মননের চূড়ান্ত প্রকাশ উপন্যাস, যেখানে জীবনের সত্য-দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। যখন উপন্যাস মুসলমান নারীর আত্মচেতনার দর্পণ হয়ে ওঠে, তখন তা যথার্থ আকর্ষণীয় ও বহুল আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। এ রকমই একটি উপন্যাস *'পদ্মরাগ'*। রোকেয়ার একটি সার্থক সৃষ্টি 'পদ্মরাগ' উপন্যাস। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের স্তরে স্তরে নারীর অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা, মানসদ্বন্দ্ব, সমাজসংঘাত, অব্যক্ত প্রতিবাদ-প্রতিকার প্রবল হয়ে উঠেছে। নারীমুক্তির অন্যতম পন্থা হলো নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এ ধ্রুব সত্য কথাটিই ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাস *'পদ্মরাগে'*। *'পদ্মরাগ'* উপন্যাস বিষয়-বৈচিত্রের দিক থেকে অভিনব। এটি মূলত একটি সামাজিক উপন্যাস। সকল ধর্মের পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা যে নিগৃহীতা ও নির্যাতিতা তা এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাবলম্বনের শিক্ষা এবং এর মধ্যদিয়ে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী সত্তার বিকাশসাধন। নির্যাতিত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও পুরুষের সুপরিকল্পিত দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি মুসলিম নারীজাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনই ছিল রোকেয়ার জীবনের ব্রত। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি লেখনীর সাহায্যে তাঁর চিন্তাধারা সমাজের নিকট পেশ করেন এবং বাস্তবজীবনে তাঁর চিন্তাধারণা কার্যকরী করারও প্রচেষ্টা করেন। *পদ্মরাগ* ছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন সম্পর্কিত একটি উপন্যাস।[১] *পদ্মরাগে* বর্ণিত তারিণী ভবনের প্রতিষ্ঠাতা 'দীন তারিণীর' চরিত্রটির বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ:

> লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার তারিণীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা কেহই ছিল না; ছিলেন কেবল তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সপ্তবর্ষীয়া তরুণী বিধবা দীন-তারিণী...। দেবর-ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীন তারিণী একটি বিধবা আশ্রম স্থপন করিলেন। আশ্রমের নাম রাখিলেন- 'তারিণী ভবন'। তারিণী ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। ভবনের বিরাট

* আবাসিক শিক্ষক, রোকেয়া হল ও সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

> অট্টালিকার একপ্রান্তে বালিকা বিদ্যালয় অপর প্রান্তে বিধবা আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আতুর আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল। ..তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার এই কর্মজীবনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বিরক্তই রহিলেন এবং তারিণী লক্ষাধিক টাকার অযথা শ্রাদ্ধ করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন আর তারিণীর কার্যকলাপকে বিদ্রুপ করিতেন।...দীন-তারিণী স্বীয় আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক একরূপ 'সমাজচ্যুতা' হইয়া নির্জনে বাস করিতেন।[২]

রোকেয়া নারীদের জন্য এমন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে সকল পরিত্যক্ত, বাঙালি, উপেক্ষিত, অসহায়, লাঞ্ছিত নারী তাদের সুন্দর জীবন খুঁজে পাবে এবং সমাজের সবরকম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিবে। তাই তিনি তাঁর পদ্মরাগ উপন্যাসে বলেন,

> যে বিধবার তিন কুলে কেহ নাই, সে, কোথায় আশ্রয় পাইবে? তারিণী ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে?- তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে?- ঐ তারিণী কর্মালয়ে। যে দরিদ্র দূরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, তাহারও আশ্রয়স্থল ঐ তারিণী আতুরাশ্রম।[৩]

'*পদ্মরাগ*' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা এক অসম সাহসিকা নারী। সিদ্দিকা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাল্যে লতিফ নামে এক যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। সংসার করা তার ভাগ্যে হয়নি। লতিফের পিতৃব্যের অর্থলোভের শিকার হলো সিদ্দিকা। তার তেজস্বী ভ্রাতা তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছে এই বলে যে বিবাহ ছাড়াও নারী বেঁচে থাকতে পারে। তার ভ্রাতা বলেছিলো, "তুই চিরকুমারী বা বালবিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হ"। সিদ্দিকা ঘটনাচক্রে গৃহত্যাগী হয়ে তারিণী ভবনে আশ্রয় লাভ করেছে এবং এখানে তার নাম হয় 'পদ্মরাগ' এ নামেই উপন্যাসের নামকরণ।[৪] সিদ্দিকা পুরুষ শাসিত সমাজের কাছে ন্যায়বিচার লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলে:

> আমি আজীবন... নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। ... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।[৫]

সিদ্দিকা রোকেয়ার মানসকন্যা। তারিণী ভবনে এসে সে প্রথম বুঝতে পেরেছে তার শিক্ষার অপূর্ণতার দিকটি। প্রথমে সে নিজেকে কোনো কাজেই সম্পৃক্ত করতে পারছিলো না। সে তৎকালীন মুসলিম সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীদের মতো শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা, নানা প্রকার সূচের কাজ ও উল বুনানো ইত্যাদি শিখেছিলো। তাই এখানে এসে দেখল ''তাহার কোনো বিদ্যাই পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই। অংক না জানার জন্য লেখাপড়া কোনো কাজে আসিল না। শেষে সেলাই করিতে চাহিলেন, তাহাতেও কাটা ছাটার হেঙ্গাম।''[৬]

নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একথা রোকেয়া বিশ্বাস করতেন। *পদ্মরাগ*- এ তারিণী কর্মালয়ের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, তাতে দেখা যায় নারীরা, কেহ শিক্ষায়িত্রী পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে নারীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন।[৭]

তারিণী বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা পদ্ধতির সাথে আমরা রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। সিদ্দিকা সমাজে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী সত্তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে চায়। তাই তারিণী ভবনে থাকাকালে আকস্মিকভাবে লতিফের সঙ্গে দেখা হয়, একে অপরকে ভালবাসে এবং লতিফ সিদ্দিকাকে নিয়ে সংসার করতে চাইলেও সিদ্দিকা তাতে অসম্মতি জানায়। কারণ যে সমাজ তাকে নিগৃহীত

করেছে সে সমাজের যূপকাষ্ঠে আর বলি হতে চায় না। আর পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনা, তেজস্বিনী মহীয়সী, গরিয়সী হউক না কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।''[৮] এখানে সিদ্দিকার ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখিকার ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত দেখতে পাওয়া যায়।

মুসলিম নারী স্বাধীনতার জন্য যদিও তিনি আজীবন সংগ্রাম চালনা করেছেন, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীর মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তো দেখতে পাই 'তারিণী ভবনে' হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান সকল ধর্মের অত্যাচারিত নারী স্থান লাভ করেছে। রোকেয়া এখানে দেখিয়েছেন শুধু বাঙালি মুসলিম নারী নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই নারী পুরুষের সুকৌশল আইনের শিকার।

বৈবাহিক জীবনে নারীর প্রতি পুরুষের অনাদর, লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিরুদ্ধেই রোকেয়ার প্রতিবাদ *'পদ্মরাগ'* উপন্যাসে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। *'পদ্মরাগ'*- এ বর্ণিত সিদ্দিকা, সৌদামণি, হেলেন, সকিনা ও রাফিয়ার কথোপকথনের মধ্যে আমরা নারীর নিপীড়িত ও নির্যাতিত অবস্থায় এবং নারীর অধিকার সম্পর্কিত রোকেয়ার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই। সিদ্দিকার উক্তি:

> সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অপমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাধিয়া তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, -ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?..... আমিও দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘর করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর 'ঘর করাই' নারী জীবনের সার নহে। মানব জীবন খোদাতায়ালার অতি মূল্যবান দান তাহা শুধু ''রাধা উননে ফু পাড়া আর কাঁদার'' জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে। সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।[৯]

নারীদের মধ্যে সচেতনতাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে রোকেয়া বারংবার নারীসমাজকে আহ্বান জানান। *পদ্মরাগ* উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সিদ্দিকার চরিত্রকে তিনি এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। দীন তারিণী লতীফের সাথে সিদ্দিকার সংসার করার প্রস্তাব জানালে সিদ্দিকা অতি কঠোরভাবে বলেন,

> ..... সংসারধর্ম আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব? তাহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন, আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি আজীবন তারিণী ভবনের সেবা করিয়া নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।[১০]

পদ্মরাগ সম্পর্কে মোহাম্মদী পত্রিকায় বলা হয়, লেখিকা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন পদ্মরাগের ভিতর দিয়া তাহাই তিনি সুন্দর করিয়া ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।[১১] রোকেয়া তার *পদ্মরাগ* উপন্যাসে নারী শিক্ষাকে যেমন নারীমুক্তির হাতিয়ার হিসেবে বলেছেন তেমনি নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও বলেছেন। মূলতঃ *পদ্মরাগ* এর মূল বক্তব্যই হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। এই উপন্যাসে প্রথাগত সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে কিভাবে নারীরা নিজেরাই নিজেদের অধিকার আদায় করে তা তিনি তারিণী ভবন আর সিদ্দিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নয় আর সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নয়।

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে নারীর সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করা সম্ভব এটা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিষয়টিকেও তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন নারীরা সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে; রাষ্ট্রের কর্ণধার নারী হবে, বিচারকের আসনে নারী বসবে। একবিংশ শতাব্দীতে দেখা রোকেয়ার এই স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ:

১ তাহমিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)

২ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *'পদ্মরাগ'* রোকেয়া রচনাবলী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ.৩৬

৩ *ঐ*

৪ মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: আনা ক্যাথরিন ম্যালেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ.৯৪

৫ *পদ্মরাগ, রোকেয়া রচনাবলী*, উৎসর্গ পত্র, পৃ.৪৫২-৫৩

৬ *ঐ*, পৃ.২৭১-৭২

৭ *ঐ*, পৃ.৩৩০

৮ *ঐ*, পৃ.৩৬৫

৯ *ঐ*, পৃ.৩৯১, ৩৯২

১০ *ঐ*

১১ *মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র, ১৩৩৭, পৃ. ৭৭২

রোকেয়ার অর্থনৈতিক ভাবনা

তানিয়া তহমিনা সরকার*

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি মুসলিম নারীর জীবনে স্বাধীনতার আকাশ উন্মোচনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্যে তিনি কর্মী, ধ্যানী এবং লেখক হিসেবে ত্রিবিধ ভূমিকা পালন করেছেন। রোকেয়া শুধু নারীর শিক্ষা ও মুক্তিসাধনে জীবনব্যাপী কর্মকৌশলের পরিচয় দেন নি, একজন বাঙালি হিসেবে কৃষি প্রধান বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

নারীর স্বাধীনতায় তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ কারণে রোকেয়া গুরুত্ব দেন নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার সাযুজ্যে নারী পেতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত উন্মুক্ত আকাশ। এ কারণে রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে নারীর অর্থ উপার্জনের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেনঃ

> 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়,তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ---সবই হইব!...উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবশ করিব। ...কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জ্জন করুক।' [স্ত্রীজাতির অবনতি]

সাধারণত নারী ও পুরুষের শ্রমের বৈষম্যমূলক মূল্য এ সমাজে দেখা যায়। নারী ও পুরুষের কায়িক শ্রমের মূল্য প্রায়শই আলাদা হয়। রোকেয়া নিজেও এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন; 'পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশী, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে ১ পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ আর চাকরাণীর খোরাকী ২' [স্ত্রীজাতির অবনতি]

নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে রোকেয়ার চিন্তা উদ্রেক হয়েছে মূলত ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে। নারী ও পুরুষের যৌথতায় এ পৃথিবী ফুল-ফল-ফসলে ভরে উঠবে; তাদের যুগপৎ প্রচেষ্টা পৃথিবী সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরুষেরা চিন্তা, কর্ম, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎকর্ষের পথে যাত্রা শুরু করলেও তাদের সহযোগী নারীরা প্রায় সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। ফলে রোকেয়া বর্ণিত সমৃদ্ধির 'দ্বিশকট যান' বড় চাকাকে (পুরুষকে) কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, সামনে এগিয়ে যেতে পারে নাঃ

> 'আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে... সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি,আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন--আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন।' [স্ত্রীজাতির অবনতি]

নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার পাশাপাশি রোকেয়া কৃষিপ্রধান বাংলার গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক মুক্তির কথাও চিন্তা করেছেন। রংপুর জেলার ছোট্ট গ্রাম পায়রাবন্দে খুব অল্প সময়ই থাকার সুযোগ পেয়েছেন রোকেয়া। বৈবাহিক

* আবাসিক শিক্ষক, রোকেয়া হল ও সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কারণে তাঁকে বাংলার পাঠ চুকাতে হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। তবুও একজন জমিদার কন্যা ও বাঙালি নারী হিসেবে বাংলার কৃষক সমাজ ও তাঁদের দারিদ্রদশার কথা তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না। তিনি জানতেন যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপরে নিম্নবিত্তের অভাব নির্ভর করে না। অভাব মোচন নির্ভর করে সামর্থ্যের উপর। আর তৎকালীন ভারতবর্ষে আয় বাড়ানোর মতো বাড়তি শ্রম দানকারী ইচ্ছুক বাঙালির সংখ্যা ছিল কম। রোকেয়া ব্যঙ্গ করে তাই তাঁর 'নিরীহ বাঙ্গালী' প্রবন্ধে বলেছেন, বাঙালি পুরুষ পরিশ্রম না করে পাশ বিক্রি করে। পরিশ্রম করে অর্থ ও সম্মান অর্জন না করে টাকা দিয়ে সম্মানজনক উপাধি ক্রয় করে। শুধু তাই নয় মৌলিক সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ বাঙালির মধ্যে নেই বললেই চলে। কোন একটি জিনিস বাজারে জনপ্রিয় হওয়া মাত্রই বাঙালি এর নকলে নেমে পড়ে। বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকরিপ্রীতিরও তিনি ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। চাকরি অর্থলাভের সহজ উপায় আর শিক্ষা চাকরি লাভের উপায় বলে শিক্ষিত বাঙালি মনে করে। অর্থাৎ শিক্ষা-চাকরি-অর্থ এই বৃত্তে আবদ্ধ বাঙালি শিক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম। তাই তাঁরা শুধু মুখস্থ বিদ্যার প্রতি বেশি জোর দেয়। ঈশ্বর প্রদত্ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের যথার্থ ব্যবহার ও মনের অন্ধকার দূরীকরণে শিক্ষার যে মাহাত্ম্যের কথা রোকেয়া বলেছেন তা অধরাই থেকে যায়। রোকেয়ার মতে, সস্তা অনুকরণের জনপ্রিয়তায় আয়ের যে প্রচেষ্টা তাতে মানুষের বিবেক এবং মন দুই-ই মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে ধন লাভ হলেও প্রকৃত জ্ঞান এবং মুক্তি দুই-ই থাকে স্পর্শের বাইরে।

শিক্ষার দৈন্য ও মনের জড়তা সম্পর্কে তাঁর এই অভিজ্ঞতা বাস্তবসঞ্জাত। প্রবন্ধে রোকেয়া বাঙালির নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে ব্যঙ্গাকারে উত্থাপন করে আমাদের দৈন্যদশাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বাঙালি তার বাজে অভ্যাস ত্যাগ করতে নারাজ। কারণ তাতে পরিশ্রম করতে হয়। এর পরিবর্তে সহমর্মিতা ও ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে বাঙালি নিজের অবস্থার পরিবর্তন করাকে শ্রেয় বলে মনে করে। আলস্যের জন্যে উদ্যোক্তার চেয়ে চাকরিজীবীর সংখ্যা বাঙালি সমাজে বেশি বলে রোকেয়া অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ জন্যেই কৃষি আমাদের আয়ের প্রধান উৎস হওয়া সত্ত্বেও এ পেশায় শিক্ষিত সজ্জনদের আগ্রহ কম। রোকেয়া বলেন: "কর্কশ উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্ত বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না! দরিদ্র হতভাগা সব অনাহারে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?" (নিরীহ বাঙ্গালী)

রোকেয়ার মতে ধনবৃদ্ধির উপায় দুইটি– বাণিজ্য ও কৃষি। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিন্দাবাদের মতো বাণিজ্য যাত্রাকে বাঙালি সহজ করে নিয়েছে। কম সময় ও কম শ্রমে অনায়াসে নকল ও বিলাসদ্রব্য বিক্রি করে বাঙালি বাণিজ্য কোটা পূর্ণ করে। উপরন্তু রূপকথার গল্পের মতো রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার জন্যে পাশ নামক মূলধনও বাঙালি সহজে যোগাড় করে রাখে। কারণ এই বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও শ্রম কম লাগে কিন্তু লাভ হয় ষোল আনা:

> আমাদের অন্যতম ব্যবসায়– পাশ বিক্রয়। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য– এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ! (নিরীহ বাঙ্গালী)

অন্যদিকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যে কৃষির উপরে নির্ভরশীল, তার পরিচর্যাকারী কৃষকের অবস্থাও সঙ্গীন। রোকেয়া কৃষকের এই দুর্দশা অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় উচ্চারণ করেন, 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার'। অর্থাৎ রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে। কিন্তু ফলভোগী হবে জমির মালিক ও মধ্যসত্ত্বভোগী।

কৃষকের ভাত-কাপড় না জোটার কাহিনি চিরন্তন। তাদের দারিদ্রদশা চলমান একটি সমস্যা, যার দিকে নীতিনির্ধারকের মনযোগ কম। কৃষকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু রূপকথার গল্প বিশেষ। রোকেয়া বলেন, যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তেল ও ৪ সের ঘি পাওয়া যেত, তখনও এক পয়সার তেল কন্যার মাথায় দেওয়ার জন্য কেনার সামর্থ্য অনেক কৃষকেরই ছিল না। কৃষকের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে রোকেয়া উদাহরণ টেনেছেন তার পারিপার্শ্বিকের:

> ...দুই সের খেসারীর বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। ...কৃষকেরা পখাল (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাঁধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক... ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ও পাট-শাক লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত! (চাষার দুক্ষু)

এই হচ্ছে বাংলার কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা। যাদের কঠোর শ্রমে নিরন্ন মানুষ খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাদেরই পেটে ক্ষুধার অন্ন জোটে না। রোকেয়া কৃষকের মৌলিক চাহিদা অন্ন ও বস্ত্র– এ দুয়ের অভাবের যথার্থ চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। পুঁজিবাদের উত্থান বা সামন্তবাদের নিষ্ঠুরতা শুধু কৃষকের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী নয়। দায়ী আমাদের আপাত সৌখিনতা ও শ্রমবিমুখতাও।

রংপুর অঞ্চলে এন্ডি নামক স্থানীয় একটি পোকা থেকে একসময় কাপড় তৈরি হতো। কৃষক-বধূ এন্ডি পোকা পালন করত এবং সুতা সংগ্রহ করে কাপড় বুনত। অবসরে, গল্পেও তাদের হাতে শোভা পেতো সূতা কাটার টেকো। কিন্তু সভ্যতার বর্ণিল প্রবাহে কৃষাণীর এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এন্ডি কাপড় গরম হলেও বর্ণহীন। সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত মিহি সুতোর রঙিন কাপড়ের কাছে এন্ডির মোটা খসখসে বিবর্ণ রঙ চাহিদাহীন ও উপেক্ষিত। এভাবে এন্ডি একসময় হারিয়ে যায় বাংলার কৃষকসমাজের জীবন থেকে। শীতে উষ্ণতা ছড়ানো এন্ডি বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বও হারিয়ে ফেলে। অথচ এই এন্ডিই আসাম সিল্ক নামে শার্ট-প্যান্ট ও কোটের কাপড় হিসেবে তৎকালীন অভিজাত ইউরোপিয়ানদের আভরণে ব্যবহৃত হত। এভাবেই বিলাস ও সহজলভ্যতার কারণে পল্লি নারীদের বানানো অনেক সৌখিন ও প্রয়োজনীয় জিনিস হারিয়ে গেছে এই বাংলার বুক থেকে। রোকেয়া চান সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে বিলুপ্ত দেশি শিল্পসমূহ আবার নতুন করে জেগে উঠুক। কুটিরশিল্পের উত্থানে কৃষকের দারিদ্রদশা দূর হওয়ার পাশাপাশি এই বাংলার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনা সহজ হবে। চাষার চিরন্তন অভাব দূর করতে রোকেয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাব দিয়েছেন:

> জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র ঘুচিবে। (চাষার দুক্ষু)

চাকরি নামক মহার্ঘ্য বস্তুর দিকে নজর থাকার ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি তো বটেই, অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষও তাদের প্রাচীন ও পরম্পরাগত পেশার প্রতি অনীহা পোষণ করে। অথচ বিলাসিতার গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে সামান্য পরিশ্রমে দেশীয় কুটির শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সহজ হবে।

নারী ভাবনা, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তা নিয়ে যতটা আলোচনা করা হয়, তার সমাজ, দেশ বা অর্থনৈতিক ভাবনা ততটাই উপেক্ষিত হয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করলেও রোকেয়ার শিকড় এই বাংলার মাটিতে প্রোথিত। ফলে মাটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কৃষকের

দৈন্য তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। কারণ কৃষকের দৈন্য মানেই রুগ্ন অর্থনীতি। বাঙালির শ্রমবিমুখতা এবং ঝুঁকিহীন, দায়হীন অর্থ উপার্জনের চেষ্টাকে তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। বাঙালি তার প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করুক স্বীয় প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায়– এ ভাবনা থেকে তিনি আমাদের দৈন্য দশার প্রকৃত কারণ এবং এ থেকে উত্তরণের সঠিক পথ-নির্দেশনা দান করেছেন। অবাক লাগে মাটির সংস্পর্শহীন জমিদার পরিবারের কন্যা ও উচ্চবিত্তের স্ত্রীর পক্ষে তাঁর ভাবনার প্রগাঢ়তা দেখে। শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি এবং শিক্ষা এ খাতগুলোর স্বনির্ভরতা ও পারস্পারিকতার উপরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। তৃণমূলের উন্নয়ন না ঘটলে কোন দেশ উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করতে পারে না। সমাজের এ অন্ত্যজ শ্রেণির দুরবস্থা নির্ণয়পূর্বক দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রোকেয়ার চিন্তার স্বাতন্ত্র্য তৎকালীন প্রেক্ষাপটে আমাদের অবাক করে দেয়। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তার গভীরতা ও কর্ম সম্পাদনের নিপুণ দক্ষতার জন্য শ্রদ্ধা জানাতেই হয়।

সহায়ক গ্রন্থ:

আবদুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

প্রত্যাবর্তন

রিফাত সুলতানা

কিছুদিন আগেও আমরা ছিলাম দুরন্ত তরুণী যাদের মনগুলো ছিল তারুণ্যের আলোয় দীপ্ত। আমিসহ প্রায় ৫৬জন, সকলেই থাকতাম রোকেয়া হলের নিচতলার সব থেকে প্রথম গণরুমটিতে। নাম তার উৎসব। নামটির পুরোপুরি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলাম এই রুমটিতে এসে। প্রথম কিছুদিন খুব অসহায় লাগতো। অসহ্য মনে হতো সবকিছু। ছোট একটি বিছানায় দুজন। সারি সারি বিছানা, কোথাও এতটুকু জায়গা ফাঁকা নেই। কিন্তু ভালোবাসার, যত্নের, সৌজন্যের অভাব নেই এতটুকুও। ভালোবাসা দিয়ে কি করে অন্যের সাথে মিলেমিশে এক জায়গায় ৫৬ জন মেয়ে, সুন্দর করে বাঁচতে পারে, তা এই গণরুমে না থাকলে কোনদিন ঠাহর করতেই পারতাম না। মাঝে মাঝেই কথা কাটাকাটি শুরু হতো, সৃষ্টি হতো দ্বন্দ্বের। কিন্তু সেটির স্থায়িত্ব জানলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। বড় জোড় ৪-৫ ঘণ্টা। তারপর আবারো আমাদের মাতামাতি। মাঝে মাঝেই খুব বিকট ধরনের গান ছেড়ে উরাধুরা নাচ, কখনো বা খিচুড়ি রান্না করে সকলে মিলে খাওয়া, কখনো বা শাড়ি পড়ে সকলে মিলে রংঢং করা। আরো কত কী!

সকলের জন্মদিন চুপিচুপি জেনে রাত বারোটায় তাকে সারপ্রাইজ দেওয়া ছিলো আমাদের নিয়মিত আয়োজন। এতক্ষণ তো মজার কথাগুলো শুনলেন কিন্তু এবার আসি খুব কড়া কিছু কথায়। রুমে সব থাকলেও এত এত মানুষের জন্য আছে অনেক অনেক নিয়ম। নিয়মের বাইরে গেলেন তো আপনি মরলেন। কত যে মিটিং, মিছিল, আন্দোলন করেছি ১৫-১৬ জন মিলে। জুনিয়রদের ডেকে র‍্যাগ দেওয়া। তাদের খুব করে শাসন করা, অবশেষে তাদেরকে আদর করে বুকে নিয়ে মুড়ি মাখা খাওয়ানো ছিলো খুব আনন্দের। মেয়েরা যে কত কেনাকাটা করতে পছন্দ করে তা এই রুমে না আসলে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। আর মেয়েরা যে কতটা দুষ্টু হয় তা আমাদের না দেখলে বোঝা দায়। ঐতো সেদিন, ঝড়ের দিনে সকলে মিলে আম কুড়ালাম। সকালবেলা ক্যাম্পাসের লিচু চুরি করলাম। হা হা হা। ৫৬ জনের ৫৬টি এলাকার ভাষা, খাবার সব আজ আমার দখলে। কিন্তু আজ হঠাৎ দুপুরে যখন টুকিটাকিতে বসে আমি হেসে কুল পাচ্ছিলাম না ঠিক সে মুহূর্তে আয়েশার ফোন পেলাম। বললো- রিফাত, সবার রুমে সিট হয়েছে। কথাটা শুনে বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চিনচিন ব্যথা অনুভব করলাম। কি অদ্ভুত এক বিচ্ছেদ তাই না? আজ আর আনন্দ নেই, উৎসব নেই, গান-গল্প কিছুই নেই। সকলকে চলে যেতে হলো উৎসব থেকে কিন্তু উৎসব তার গতিধারায় আবারো পূর্ণ হলো নতুন নতুন রিফাতদের হাসি গানকে সাথে নিয়ে।

*৪র্থ বর্ষ, সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোর

ফারজানা শারমিন*

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে চোখ পড়ে যায় অন্ধকারে
কালো কালো ছায়া মূর্তি
যেন প্রেতাত্মার অভিশপ্ত শব বন্ধঘরে;
এলোমেলো ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি নেমে আসে
তাদের উদ্বাস্তু অদৃশ্য শরীরে।

আমি তবুও চেয়ে থাকি ভোরের আলোর খোঁজে,
অন্ধকারে আলো আসে না তবুও
দৃষ্টি মেলে রাখি
এই কংক্রিটের আত্মাহীন দেহে।

বুকের ব্যথা তীব্রতর হয়, চোখ দেখে ঘোর অন্ধকার
কৃষ্ণপক্ষের প্রথম প্রহর, মধ্যরাতে আঁধার কাটে আবার।

ভোর হয়।
জেগে দেখি ছোট্ট শালিক কিম্বা দোয়েল;
আমারই মতো দ্বিধাযুক্ত, পোকা খোঁজে এদিক সেদিক।
আমি খুঁজি পাশে রাখা একটি দামী ফোন
নীল আলো আমাকে জাগিয়ে রাখে
শান্তি দেয় শরীরে আমার।

ঘোরের আবেশে দিকভ্রষ্ট, কোথাও যেন
ফেলে এসেছি রক্তজবার মালা।
সেই কবে অরণ্যাচারী ছিলাম, বনের পশু
ছিল সহচর; ভুলে গেছি আজ!

দূর অতীত গল্প হয়ে গেছে, আমি একা
এখন হাতে কেবল একটি মুঠোফোন।

*নৃবিজ্ঞান বিভাগ (৪র্থ বর্ষ), রুম: ৪৩০, রোকেয়া হল, রা.বি.

রোকেয়ার জীবনী

বাঙালি নারীমুক্তি ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া খাতুন ওরফে 'রকু', বিবাহ পরবর্তী যাঁর নাম হয়েছিল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং লেখালেখি করতেন মিসেস আর এস হোসেন নামে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বা অন্য কেউ তাঁকে 'বেগম' উপাধি দেয়নি, এমনকি জীবিতকালে তিনি কোথাও নামের সঙ্গে বেগম কথাটি লিখেননি। পরবর্তীকালে বিভিন্নজনের সম্বোধনে ও লেখায় তাঁর নামের পূর্বে বেগম শব্দটি প্রযুক্ত হয়। তিনি একাধারে ছিলেন সমাজকর্মী, তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক। সাহিত্যিক হওয়ার জন্য তিনি সাহিত্যচর্চা করেননি, কর্মী হিসেবে সমাজ সংশোধন, নবনির্মাণ ও সচেতনতা তৈরির মানসে তিনি সাহিত্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করেছিলেন।

তিনি ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর ঔপনিবেশিক বাংলার রংপুরের পায়রাবন্দে এক রক্ষণশীল সামন্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন বহুবিবাহকারী, বিলাসী, সামন্ত জমিদার, আর মাতা রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী ছিলেন পর্দাপ্রথার গোঁড়া সমর্থক একজন গৃহবধূ। জহীর সাহেবের চার স্ত্রী, প্রথম পক্ষের কন্যা রোকেয়া, তাঁর দুই ভাই: ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের এবং দুই বোন: করিমুন্নেসা ও হোমায়রা। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ছয় ও তিন। সাবের পরিবার ছিল তৎকালীন মুসলিম অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণিভুক্ত, পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু, সেখানে বাংলা ও ইংরেজির প্রবেশাধিকার ছিল না, নারীদের ক্ষেত্রে ঘোরতর অবরোধ প্রথায় বিশ্বাসী। পিতা জহীর সাবেরের চার স্ত্রীর একজন ইংরেজ মহিলা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই স্ত্রীকে পরিতুষ্ট করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিয়েটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ধারণা করা হয়, এই ইংরেজ মহিলা তাকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন, যার কারণে তিনি দু'পুত্র ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবেরকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়ার পিতা ছিলেন নারীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী। কন্যা করিমুন্নেসার বাংলা শেখার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি তাকে মাতামহের আলয়ে প্রেরণ করে তড়িঘড়ি বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। লেখাপড়ার প্রতি রোকেয়ার দুর্দমনীয় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পিতার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। বড়ভাই ইব্রাহিম সাবের ছিলেন নারী শিক্ষার সমর্থক, তার তত্ত্বাবধানে করিমুন্নেসা ও রোকেয়া ইংরেজি শিখেছিলেন। বাড়িতে দিনের বেলায় পড়ালেখার তো প্রশ্নই ওঠে না, তাই রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষে মোমবাতির আলোয় বড়ভাইয়ের কাছে চলত রোকেয়ার পাঠদান। রোকেয়ার বাংলা ভাষা শিক্ষা বড়বোন করিমুন্নেসার উৎসাহ ও সহায়তায়ই সম্ভব হয়েছিল। তিনি তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে এই দু'জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় চল্লিশ বছর বয়সী ভাগলপুর নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিপত্নীক খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। স্বামীর প্রথম পক্ষের একটি কন্যা সন্তান ছিল। রোকেয়ার দুটি কন্যা জন্মেছিল, কিন্তু প্রথমজন পাঁচমাস এবং দ্বিতীয়জন চারমাস বয়সে মারা যায়। ১৯০৩ সালে ৩ মে স্বামীর মৃত্যুতে তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে অকালে বিধবা হন। স্বল্পস্থায়ী বিবাহিত জীবনে স্বামীর আনুকূল্যে তাঁর প্রতিভার চর্চা ও বিকাশ লাভ করে। তাঁর সৃজনশীল, মুক্তচিন্তাবাহী, সাহসী ও নির্ভীক ভাবদীপ্ত রচনাগুলো স্বামী সাখাওয়াতের জীবিতকালে লেখা। ১৯০৩ সাল থেকেই তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প তৎকালীন প্রতিনিধি স্থানীয় প্রায় সকল পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তৎকালীন নবপ্রভা, নবনূর, মহিলা, ভারত মহিলা, সওগাত, সাধনা, ধুমকেতু, নওরোজ, মাসিক মোহাম্মদী, মোয়াজ্জিন, গুলিস্তাঁ, মাহে-নও, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গলক্ষ্মী, সবুজপত্র, সাহিত্যিক, আল এসলাম, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি পত্রিকাতে বিভিন্ন সময় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ 'মতিচূর' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ বছরই তাঁর কল্প-উপন্যাস Sultana's Dream মাদ্রাজের Indian Ladies Magazine এ প্রকাশিত হয়।

ভাগলপুরে থাকাকালীন স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাত্র দুই দিনে এই রচনার খসড়াটি প্রস্তুত করেন এবং স্বামী ফিরে এলেই সেটা তাঁকে দেখান। তাঁর স্বামী সেটা পাঠ করেই বলে ওঠেন, "A terrible revenge" অর্থাৎ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। পরবর্তীকালে রোকেয়া স্বয়ং এটিকে বাংলায় "সুলতানার স্বপ্ন" নামে অনুবাদ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর রোকেয়া ভাগলপুরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কলকাতায় ১৯১০ সালে চলে আসেন এবং ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার অলিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে ৮জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের পুনর্যাত্রা শুরু করেন। পরে তা ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ' ১৯১২ সালে রচিত এবং ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (ইসলামী নারী সংগঠন) নামে জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো সমকালীন সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে তুলে ধরা এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা। এ সংগঠনের আওতায় তিনি কলকাতার বস্তিবাসী ও বিত্তহীন নারীদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করে তাদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তিনি শিক্ষাকে নারী উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে দেখেছেন। তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: মতিচূর (১ম খণ্ড, ১৯০৫), Sultana's Dream (১৯০৮), মতিচূর (২য় খণ্ড, ১৯২১), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯২৮)।

রোকেয়ার শেষ রচনা 'নারীর অধিকার' ৮ ডিসেম্বর রাত এগারটায় লিখিত হয়। মরণোত্তর মাহে-নও পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে ভোর ৫.৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ক্ষণজন্মা এ মানবীর মরদেহ আত্মীয় মাওলানা আব্দুর রহমান খানের পারিবারিক কবরস্থান কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের শুখচরে সমাহিত করা হয়। তিনি সকলকে ডাক দিয়েছিলেন এই বলে, "আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খ্রিষ্টান অথবা বাঙালি, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি- আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথম ভারতবাসী- তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।"

হল পরিচিতি

রোকেয়া হল ১৯৮০ সালের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে। এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্রীহল। শুরুতেই এ হলের নাম ছিল "বেগম রোকেয়া হল"। ০১.০৬.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সিন্ডিকেট সভার ১২ (ক) নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের "বেগম রোকেয়া হল" এর নাম সংশোধন করে "রোকেয়া হল" করা হয়েছে। হলের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। হলের শিক্ষার্থীবৃন্দ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়ানুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া, আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সফলতার সাক্ষর রেখে চলেছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে, বার্ষিক মিলাদ ও সনাতন ধর্মের সরস্বতী পুজায় হল প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রীরা যুক্ত থাকে। বিশেষভাবে রোকেয়া দিবসটি এ হল নানা আঙ্গিকে পালন করে থাকে। গত তিনবছর থেকে রোকেয়া দিবসে প্রাজ্ঞজনের উপস্থিতিতে হলের অভ্যন্তরে আলোচনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। বিগত চার বছর একাধারে (৩৯ তম, ৪০তম, ৪১তম, ৪২তম) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। করোনাকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকায় ছাত্রীদের এ বছর জয়ানন্দ প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি।

হলের সিট সংখ্যা: ৭২০ টি
গণরুম: ৬টি। উৎসব, আনন্দ, রংধনু, বকুল, মৈত্রী, মেলা।
গণরুমের সিট সংখ্যা: ১৭১টি।
আবাসিক শিক্ষার্থী: ৭২০ জন।
অনাবাসিক শিক্ষার্থী: ১৩৮৫জন
আবাসিক শিক্ষক: ৫ জন
কর্মকর্তা: ৬ জন
সাধারণ কর্মচারী : ৪জন
হলসুপার: ৩ জন
পরিচ্ছন্ন কর্মী: ১০ জন
প্রহরী : ৭জন
আয়া: ৮ জন
মালি: ২ জন
ডাইনিং কর্মচারী : ১২ জন

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা

নাম	পদবী
রাজিয়া বেগম	উপ-রেজিস্ট্রার
প্রনব কুমার বিশ্বাস	উপ-রেজিস্ট্রার
তৈয়বা পারভীন	উপ-রেজিস্ট্রার
শবনম আফরীন	সিনিয়র আবাসিক শিক্ষিকা
সামিমা আকতার	সহকারী রেজিস্ট্রার
চৌধুরী সারমিন আকতার বিন্‌তে আম্বিয়া	সহকারী রেজিস্ট্রার
মো. পিয়ারুল ইসলাম	সেকশন অফিসার
মোসা. মনোয়ারা পারভীন	তত্ত্বাবধায়ক (এ্যাডহক)
ফরিদা পারভীন কেয়া	তত্ত্বাবধায়ক (হল ফান্ড)
মো. ফারুক আকতার	অফিস পিয়ন
সুলতানা পারভীন	অফিস পিয়ন (মাস্টাররোল)
মো. মানিক	প্রহরী
মো. আবির হোসেন	প্রহরী
মো. কামাল হোসেন	প্রহরী
মো. রহুল আমীন	প্রহরী (এ্যাডহক)
মো. লিটন	প্রহরী (মাস্টাররোল)
মো. আব্দুল কাইয়ুম	প্রহরী (মাস্টাররোল)
মো. রতন আলী	প্রহরী (মাস্টাররোল)
মোসা. ফাতেমা বেগম	আয়া
মোসা. ফরিদা ইয়াসমিন	আয়া (মাস্টাররোল)
মোছা. সহিদা বেগম	আয়া
মোসা. রহিমা বেগম	আয়া
মোছা. কানিজ ফাতেমা	আয়া
সৈয়দা জান্নাতুল ফেরদৌস	আয়া
মোছা. সাহিনা বেগম	আয়া

মোছা. মমতাজ বেগম	কমনরুম বেয়ারার (এ্যাডহক)
মো. ইয়াদ আলী	মালী
মো. শরিফ উদ্দীন	মালী
মোসা. আসমা খাতুন	সুইপার
মোসা. দিলারা বেগম	সুইপার
মোসা. সাধিনা বেগম	সুইপার
মোছা. লতিফা আকতার	সুইপার
শ্রী স্বপন কুমার	সুইপার
শ্রীমতি কুসুম	সুইপার
মিনা জমাদারনী	সুইপার
শ্রীমতি বুলবুলি	সুইপার
বাবলু জমাদার	সুইপার
শ্রীমতি জুলি রানী	সুইপার (হলফান্ড)
শ্রীমতি সন্ধ্যা রানী	সুইপার(হলফান্ড)

প্রাধ্যক্ষের পরিচিতি

সেলিমা খাতুন
ভূগোল
০১.০৭.১৯৮০ থেকে
২৮.০২.১৯৮২

মিসেস জিনাত ফেরদৌস
ভূগোল
০১.০৩.১৯৮২ থেকে
২৮.০২.১৯৮৫

ড. মিসেস শওকত আরা
মনোবিজ্ঞান
০১.০৩.১৯৮৫ থেকে
৩০.০৩.১৯৮৮

প্রফেসর হোসনে আরা হোসেন
পরিসংখ্যান
৩১.০৩.১৯৮৮ থেকে
৩০.০৩.১৯৯১

ড. শামসুন নাহার
উদ্ভিদবিদ্যা
৩১.০৩.১৯৯১ থেকে
২৪.০৬.১৯৯২

ড. মোহাঃ শামসুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)
রসায়ন
২৫.০৬.১৯৯২ থেকে
০৪.১০.১৯৯২

বেগম নীলুফার সুলতানা
সমাজবিজ্ঞান
০৪.১০.১৯৯২ থেকে
০৭.১০.১৯৯৫

ড. আসমা সিদ্দিকা
আইন
০৮.১০.১৯৯৫ থেকে
২০.০৮.১৯৯৮

ড. মো. আহসান হাবিব (ভারপ্রাপ্ত)
ফলিত রসায়ন
২১.০৮.১৯৯৮ থেকে
১৫.১১.১৯৯৮

ড. জাহান আরা খানম
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান
১৬.১১.১৯৯৮ থেকে
১৭.১১.২০০১

ড. তাহ্‌মিনা আলম
ইতিহাস
১৮.১১.২০০১ থেকে
১৭.১১.২০০৪

ড. নাজমা আফরোজ
মনোবিজ্ঞান
১৮.১১.২০০৪ থেকে
১৭.১১.২০০৭

ড. শেখ কবির উদ্দিন হায়দার (ভারপ্রাপ্ত)
সমাজকর্ম
১৮.১১.২০০৭ থেকে
২৯.১১.২০০৭

সৈয়দ আফরীনা মামুন
সমাজকর্ম
৩০.১১.২০০৭ থেকে
০৫.০৫.২০০৯

ড. মোসা. ছায়িদা আকতার
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
০৬.০৫.২০০৯ থেকে
৩১.০৭.২০১২

ড. জান্নাতুল ফেরদৌস
সমাজকর্ম
০১.০৮.২০১২ থেকে
৩১.০৭.২০১৫

প্রফেসর ড. রুবাইয়াত ইয়াসমিন
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জি.
০১.০৮.২০১৫ থেকে
২৫.০৯.২০১৮

প্রফেসর ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা
ফোকলোর
২৫.০৯.২০১৮

বর্তমান প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ

মোবার্‌রা সিদ্দিকা
প্রাধ্যক্ষ ও প্রফেসর
ফোকলোর বিভাগ

ড. মোঃ গোলাম রাশেদ
আবাসিক শিক্ষক
সহযোগী অধ্যাপক
আইসিই বিভাগ

ড. হোসনে আরা খানম
আবাসিক শিক্ষক
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ

ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
আবাসিক শিক্ষক
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

ড. মনি কৃষ্ণ মহন্ত
আবাসিক শিক্ষক
সহযোগী অধ্যাপক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মচারীবৃন্দ

মালী ও প্রহরীবৃন্দ

ডাইনিং কর্মচারীবৃন্দ

হলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র

মহান শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বার্ষিক মিলাদ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় শোক দিবসে রোকেয়া হলের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

রোকেয়া দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

রোকেয়া দিবসে প্রফেসর অরুন কুমার বসাক

রোকেয়া দিবসে অতিথিবৃন্দ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিজয় দিবসে আনন্দ শোভাযাত্রা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা

আন্তঃ কলেজ এ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন পুরষ্কার গ্রহণ

রোকেয়া হল

৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস উপলক্ষে
রোকেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হলের ঘাস কাটা ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি

অন্তঃ ছাত্রী হল বার্ষিক সাংকৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান